সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ● মে-জুন ২০১৫ ● পাঁচ টাকা

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও বামপন্থীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

গত ২৮ এপ্রিল দেশের তিনটি সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব জাতীয় নির্বাচন থেকে কম ছিল না। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য শতাধিক বিদেশি এবং দুই হাজারেরও অধিক দেশি পর্যবেক্ষক ছিলেন। ইউরোপিয় ইউনিয়ন, ইউএনডিপি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, সুইডেন, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষক ও একাধিক সংস্থা পর্যবেক্ষণে ছিল। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরে জাতিসংঘের মহাসচিবকে টেলিফোন করে নির্বাচন সম্পর্কে অবগত করেছেন। কোন দেশের অভ্যন্তরের স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এরকম পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগ বিশ্বে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। আওয়ামী লীগ ৫ জানুয়ারি ২০১৪-এ একটি ভোটারবিহীন, অগণতান্ত্রিক, সম্পূর্ণ একতরফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় এসেছে। তার অধীনে এই নির্বাচনে মহাজোট ও তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ২০ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলোসহ তিনটি বামদল অংশগ্রহণ করেছে। ফলে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা নির্বাচনকে বেশ গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল। তারা দেখতে চেয়েছে যে আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয় কি না। তার ফ্যাসিবাদী শাসন বহাল রেখে, তার নেতৃত্বেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা চালু হয় কি না।

পত্র-পত্রিকা-টেলিভিশন চ্যানেলে ও নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখেছে কি নজিরবিহীন রিগিং এ নির্বাচনে হয়েছে। কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, গণ সীল, ব্যালট ছিনতাই, কেন্দ্র ভাংচুর, গুলি, বোমাবাজি – কি হয়নি এ নির্বাচনে। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তারা ছিলেন অসহায়। বিএনপি বেলা ১২টায় নির্বাচন বর্জন করলেও তাদের নামে বিপুল সংখ্যক প্রাপ্ত ভোট দেখানো হয়েছে। বিএনপি নেতারাও বলেছেন, এই ভোট তাদের প্রাপ্ত ভোট নয়। নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সরকার পরিকল্পিতভাবে 'টেবিল মেড' ফলাফল হাজির করেছে। পত্র-পত্রিকায় অনেকেই লিখেছেন, এ কাজ একমাত্র স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সময় হয়েছে। অথচ নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঢাকার নতুন মেয়ররা দেখা করতে গেলে তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের বলেছেন, জনগণ তাদের সাথে আছে।

কেন সরকার এ সময়ে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আয়োজন করলো?

২০১৩ সালের শেষের দিকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের প্রথম দফা মেয়াদকালের শেষের দিকে দেশের ৪টি সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন হয়েছিল। তার সবকটিতেই আওয়ামী লীগ হেরেছে। ৫ বছরের শাসনে জনগণের যে ক্ষোভ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছিল তারই প্রতিফলন ছিল এটি। এরপর আরও দেড় বছর পার হয়েছে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ নির্লজ্জভাবে ৫ জানুয়ারির একটি সাজানো *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী লাঞ্ছনা

বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলছে

মাস পেরিয়ে গেলেও বর্ষবরণে টিএসসিতে নারী লাঞ্ছনাকারীদের কাউকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারে নি। প্রথম দিকে এ ঘটনাকে অস্বীকার করার বহু চেষ্টা সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রসমাজ, নারীসমাজসহ দেশবাসীর সোচ্চার প্রতিবাদ সামাল দিতে লক্ষ টাকার পুরস্কারের আড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ভিডিও ফুটেজে অপরাধী শনাক্ত করা গেলেও তাদের ধরা যাচ্ছে না অথচ মিথ্যা অভিযোগে যখন তখন যে কাউকে ধরপাকড়ে পুলিশ বিন্দুমাত্র কসুর করে না। এর মধ্যেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী লাঞ্ছনার শিকার হন ছাত্রী ও শিক্ষিকা। ঢাকার একটি নামকরা স্কুলে শিশু বয়সী ছাত্রীদের উপর যৌননির্যাতনের খবর আমাদের হতভম্ব করেছে। খবর এসেছে, এক গার্মেন্ট কর্মীকে চলন্ত বাসে ধর্ষণ করে রাস্তায় ফেলে দেয়ার।

প্রশ্রয় পেলে নির্যাতকরা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে এসব ঘটনায় তার সাক্ষ্য মেলে। চারিদিকে যখন নারী নির্যাতনের এরকম বীভৎস উৎসব চলছে তখন প্রশাসন এমন নির্বিকার কেন? নিস্পৃহ কেন? 'এ আর এমন কিছু নয়', 'হাজার লোকের সমাবেশে একটু-আধটু হয়', 'ছেলেদের সামান্য দুষ্টুমি', 'পাশের বাড়ির ছেলেদের কাজ' – এসব বলে ঘটনাকে গুরুত্বহীন করে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখার মধ্যে রয়েছে এর শেকড়। মানুষকে সংবেদনহীন করে তোলা, অভ্যস্ত করে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

নারী নির্যাতন এখন প্রতিদিনের *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মানব পাচারের নামে দাস ব্যবসা পুঁজিবাদের নগ্ন চেহারাকেই উন্মোচিত করেছে

সম্প্রতি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূল থেকে কয়েক হাজার বাংলাদেশি ও বর্মী রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে, যারা অনাহার ও নির্যাতনে প্রায় অর্ধমৃত। থাইল্যান্ডের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কয়েকশ জনকে। এই লেখাটি তৈরির সময় পর্যন্ত খবরে জানা যাচ্ছে, প্রায় আট হাজার মানুষ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার উপকূলে খোলা সাগরে ভাসছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভয়ে পাচারকারীরা তাদের খোলা সমুদ্রে ফেলে গেছে, যাদের কোনো খাদ্য নেই, পানি নেই। কোনো দেশই তাদের আর আশ্রয় দিচ্ছে না। এদের বেশিরভাগই বাংলাদেশী ও বর্মী রোহিঙ্গা। আরো অগণিত মানুষ, তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত কেউ জানে না – যাদের অনেকেই লাশ হয়ে সাগরে ভেসে গেছে, অনেকের ঠাঁই হয়েছে গণকবরে, অনেকে বন্দি *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধান-সহ ফসলের ন্যায্যমূল্য ও উন্নয়ন বাজেটের ৪০% বরাদ্দের দাবিতে

কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ জেলায় জেলায় বিক্ষোভ-অবরোধ

স্মারকলিপি পেশের পূর্বে ঢাকার রাজপথে ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এবং বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে কৃষিখাতে উন্নয়ন বাজেটের ৪০% প্রত্যক্ষ বরাদ্দ, ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু, ধান-ভূট্টাসহ ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, হাটে-বাজারে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়, সকল বয়স্ক এবং অসহায় নারীদের মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা প্রদান, ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ, গ্রামীণ গরিব মানুষের জন্য আর্মি রেটে রেশন, ভূমিহীনদের খাসজমি প্রদান, সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেলের দাম কমানো, কৃষি উপকরণ বিএডিসি'র মাধ্যমে সরবরাহ, টিআর-কাবিখা-কর্মসৃজন-ভিজিএফ-ভিজিডিসহ সকল সরকারি সাহায্যের সংখ্যা-পরিমাণ-সময় বৃদ্ধি এবং অনিয়ম দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং সহজ শর্তে সুদমুক্ত ব্যাংক ঋণ প্রদান ও এনজিও-মহাজনী সুদ আইন করে নিষিদ্ধ করার দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে ৭ মে ঢাকায় বিক্ষোভ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গাইবান্ধায় ধানচাষীদের সড়ক অবরোধ

৩১ মে ধানচাষীদের অবস্থান

হাটে হাটে ক্রয় কেন্দ্র চালু করে সরকার ঘোষিত মূল্যে (৮৮০ টাকা) খোদ চাষীদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের দাবিতে আগামী ৩১ মে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে সারাদেশে ধানচাষীরা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলায় ইউএনও কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও বামপন্থীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় এসেছে। জনগণের সবরকম গণতান্ত্রিক দাবিকে উপেক্ষা করে গায়ের জোরে, লাঠির জোরে সে টিকে আছে। এবং সে টিকে আছে দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। তাকে উৎখাত করার ধারে-কাছেও কোনো শক্তি নেই। একটা বড় রকমের আন্দোলন করে তাদের সমস্যায় ফেলবে সেরকম কোনও সম্ভাবনা এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু মানুষের মনে পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। চূড়ান্ত অজনপ্রিয়তার এ সময়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন ঘোষণার একটি উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরকে আধুনিক করে গড়ে তোলা – এ লক্ষ্যে নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়নি। তাহলে এই সময়ে কেন নির্বাচন?

আসলে এ নির্বাচন সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য আয়োজন করেনি। নৈতিক-গণতান্ত্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করবে, এ চিন্তাও তার ছিল না। কিন্তু গ্রহণযোগ্য করার কথা বলে সকল রাজনৈতিক শক্তিকে তার পেছনে জড়ো করা, মাথা নত করানো – এ কাজটি করা এবং সাথে সাথে তার ডাকে বেশিরভাগ দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তার শাসনের বৈধতা দেয়া, ন্যায্যতা তৈরি করা; এ জন্যেই সে নির্বাচনের ডাক দিয়েছে। আন্দোলনে ব্যর্থতার ফলে কোণঠাসা বিএনপি অসম প্রতিযোগিতা মেনে নিয়েই নির্বাচনে আসতে বাধ্য হবে – এটা বুঝেই সরকার এসময় হঠাৎ করে নির্বাচন দিয়েছে। বুঝে হোক্ বা না বুঝে হোক্, যারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন তারা সরকারের এই অসদুদ্দেশ্য পূরণে ভূমিকা পালন করেছেন।

আমরা একটা বিষয় পাঠকদের ভেবে দেখতে বলব। এই নির্বাচন ব্যবস্থা বুর্জোয়ারাই চালু করেছে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনকাজ পরিচালনা করা, শাসনকাজে জনগণের অনুমোদন নেয়া – এটা বুর্জোয়ারাই এনেছিল। জনগণের দ্বারা গঠিত, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার – এ ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বহুল উচ্চারিত শব্দমালা। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তারা যে আইন-কানুন তৈরি করেছে – তাদের ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত জনগণের উপর আরও শোষণ নির্যাতন নামিয়ে আনার জন্যই যা তৈরি – তবু মানুষের মত প্রকাশের কিছু সুযোগ ও তাদের কিছু অধিকার এই আইন-কানুনের মধ্যে থাকে। আজকে গণতন্ত্রের সেই ভানটুকুও তারা ধরে রাখতে পারছে না। আসলে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার শুরুতে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল। ফলে মতপ্রকাশের অধিকার দেয়ার বিষয়টি তাদের সামাজিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কালক্রমে পুঁজি একচেটিয়া রূপ নেয়ার কারণে তাদের সেদিনের সে প্রয়োজন আজ আর নেই।

জনবিচ্ছিন্ন বিএনপির নির্বাচন ছাড়া কোনো পথ ছিল না

বিএনপি'র নির্বাচন করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ যুদ্ধাপরাধী-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জামাতের সাথে ঐক্য এবং এদের সাথে মিলে আন্দোলনের নামে সে যা করেছে তাতে মানুষ তার ওপর এমনিতেই বিক্ষুব্ধ। মানুষকে নিয়ে আন্দোলন করার পরিবর্তে তারা পেট্রোল বোমা, গান পাউডার দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। ফলে তারা ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একদিকে সরকার কর্তৃক কোণঠাসা অবস্থা, অপরদিকে পাবলিক থেকে বিচ্ছিন্নতা – এ দুয়ে মিলে একটা বদ্ধ-আটক অবস্থার মধ্যে সে পড়েছিল, নির্বাচনটা তার জন্য একটা 'এসকেপ রুট' হিসেবে এসে গেল।

আবার বিএনপি নির্বাচনে গেলেও কিছু করতে পারবে না, সরকার তাকে ঠিকই হারিয়ে দেবে – এটা জনগণের মধ্যে শিক্ষিত, সচেতন, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন অংশ ঠিকই বুঝেছিলেন। তবে একটা আন্দোলনকারী শক্তি শ্রেণীসংগ্রামকে ভিত্তি করে যত স্পষ্ট ও প্রখরভাবে বোঝে, সাধারণ মানুষ ঠিক সেভাবে বোঝেন না। খানিকটা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে বোঝেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অর্থনীতিতে যেমন অস্থিরতা, নানা speculation তার মধ্যে হয়, তেমনি সমাজে অবস্থিত মানুষের ভাবজগতেও নানারকম speculation হয়। জনগণের মধ্যে সেটিও ছিল। যদি স্বাভাবিক নির্বাচন হয়, যদি কিছু ঘটে যায় – ইত্যাদি ভাবনা মানুষের মধ্যেও ছিল। সেটা বিএনপি কাজে লাগাতে চেয়েছে। আবার সে যদি নির্বাচনে না যায়, তাহলে জনগণের কাছে সে কী উত্তর দেবে? 'তাহলে কি করবেন? আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এলেন, তাহলে নির্বাচন না করে কি করবেন?' এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর বিএনপির কাছে নেই। সে নিরুপায়। তাই নির্বাচন করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। এটা গেল বিএনপি'র দিক।

বামপন্থীরা কেন এই প্রহসনের নির্বাচনে গেলেন?

কিন্তু বামপন্থীরা কেন নির্বাচনে গেলেন? এ সরকার অবৈধ-অনির্বাচিত-গায়ের জোরে ক্ষমতায় বসা, এর অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না – এটা যে শুধু আমরাই বলেছি তা নয়, সিপিবি-বাসদও একটা পর্যায় পর্যন্ত, ঠিক এভাবে না বললেও এই কথাগুলিই বলেছেন। গণসংহতি আন্দোলন আমাদের সাথে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা জোটভুক্ত। তারাও এই কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সরকার নির্বাচন ঘোষণা করার পরপরই সিপিবি-বাসদ তিলমাত্র বিলম্ব না করে সবার আগে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা যখন ছাপানো কাগজ নিয়ে নির্বাচনের প্রচারে নেমে গেছেন, তখনও নির্বাচন যার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই আওয়ামী লীগ তার প্রার্থী ঘোষণা করেনি। বিএনপি তখনও নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু তারা নেমে গেলেন। বামপন্থীদের প্রতি দরদ আছে, এমনকি এই নির্বাচন হওয়াটাকেও সমর্থন করেন এমন বহু মানুষ তাদের এই কাণ্ডে যার পর নাই দুঃখ পেয়েছেন। বামপন্থীরা সরকারের কূটকৌশলের পেছনে এভাবে ছুটবে তারা তা কল্পনাও করেননি।

বামপন্থীদের রাজনীতির মাঠে, লড়াইয়ের মাঠে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথেই তারা রাস্তায় নেমে গেলেন। সঠিক রাজনীতির কথা বাদ দিন, কোন্ দৈন্য তাদের দেখেশুনে পা ফেলার যে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি, তাই গুলিয়ে দিল? আসলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আছে, দেশটা শেষপর্যন্ত যাতে বিশৃঙ্খলায় পড়ে না যায়। মানে, 'যত যাই হোক নির্বাচনটা তো ঠিক আছে, নির্বাচন তো হওয়া উচিত। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা তো আসা দরকার। এভাবে তো চলতে পারে না' – ইত্যাদি। এভাবে চলতে পারে না ঠিক। সেটা পাল্টাবার জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন। তা না করে বুর্জোয়ারা যেভাবে সমাধান চায়, তার স্বার্থ রক্ষা করে যেভাবে সমাধানের চেষ্টা করে, সেটার সহযোগী কেন হলেন?

আপনারা নির্বাচন ঘোষণা করাটাকে যৌক্তিক মনে করলেন কেন? নির্বাচন কে ঘোষণা করেছে? কি উদ্দেশ্যে করেছে? সরকারকে অবৈধ-অগণতান্ত্রিক বলছেন, আবার তার দেয়া নির্বাচনকে বৈধ ও সঠিক মনে করছেন। একটি অবৈধ, অগণতান্ত্রিক, চূড়ান্ত দমনমূলক সরকার কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন ঘোষণা করে? তাহলে এরশাদের অধীনে নির্বাচন করেননি কেন? এখন কেন করছেন? সে সময়ও তো বামপন্থীরা ছোট পার্টিই ছিল। সেদিন পারলেন, আজ পারলেন না কেন? নির্বাচন বর্জন তো শুধু সামরিক শাসনের সময়ই করেননি। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকারের অধীনে যে জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল, সেটিতো আওয়ামী লীগসহ বেশিরভাগ দলই বর্জন করেছিল। ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনেও তাই ঘটেছে। সেগুলো তো বর্জন করেছিলেন এই যুক্তি এনে যে, এগুলো পাতানো নির্বাচন। এর মাধ্যমে সরকার তার আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল বের করতে চায়। এই নির্বাচনেও তো সরকার তাই চেয়েছে। তাহলে সেগুলো করলেন না, এটা কেন করলেন। এটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব কোনো অংশেই জাতীয় নির্বাচন থেকে কম ছিল না। কেন, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বামপন্থী সব দল মিলে যদি নির্বাচন না করার পয়েন্টে ঐক্যবদ্ধ থাকত, বলতে থাকত এটি অবৈধ-অগণতান্ত্রিক সরকার, এর অধীনে কোনো নির্বাচন নয়, এই ফ্যাসিস্ট সরকারের কোনো কিছুই আমরা মানব না; আর সারাদেশের শিক্ষিত-দেশপ্রেমিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করতো, কীভাবে নির্বাচন করলে গণতান্ত্রিক হবে তার রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করতো – সেটাই হতো সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ। তা না করে যে সরকার এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমস্ত ঐতিহ্য ও অর্জনকে পদদলিত করে গোটা দেশকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিলো, সেই ভয়ঙ্কর সরকারকে সহযোগিতা করলেন।

নির্বাচনে গিয়ে বামপন্থীদের কী লাভ হলো? তাদের নেতাদের প্রচার হলো, তাদের দলের প্রচার হলো। একথা তো ঠিক যে, দলের লাভ হলেও মানুষের লাভ নাও হতে পারে। কারণ তাদের এত প্রচার গণআন্দোলনের নেতা হিসেবে হয়নি। গণআন্দোলন সংগঠিত করতে করতে তৃণমূল থেকে ধীরে ধীরে জননেতায় পরিণত হয়ে তারা ভোটে আসেননি। শাসক দল নিজেদের প্রয়োজনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে তাদেরকে প্রচার দিয়েছে। বুর্জোয়ারা তাদের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও এর বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার জন্য জন্য একটা মাত্রা পর্যন্ত ভিন্নমত প্রচারের সুযোগ দেয়, এভাবে 'টক শো'গুলোর মাধ্যমে তারা কিছু নেতাকে পরিচিত করে তোলে।

যাই হোক, বামপন্থীরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বয়কট করেছেন। বিএনপি তো তবু বেলা ১২টার দিকে নির্বাচন বর্জন করেছে। সিপিবি-বাসদ পুরো নির্বাচনটাই করলেন। যখন দেখলেন কোনো বিরোধী দলই নির্বাচন গ্রহণ করছে না, তখন উপায় না দেখে বর্জন করলেন। এটা কি আন্দোলনমুখী কোনো বর্জন হলো? এই নির্বাচনের একটি ফলাফল ঘোষিত হয়েছে এবং সেখানে বামপন্থীরা কত ভোট পেয়েছেন তাও দেখানো হয়েছে। বামপন্থী বন্ধুরা বলেছেন, ভোট কম দেখানো হয়েছে। আরও বেশি ভোট তারা পেতেন। ফলাফল প্রসঙ্গে বিএনপির নেতারা বলেছেন, ফলাফলে তাদের প্রাপ্ত ভোট বেশি দেখানো হয়েছে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস বলেছেন, এটি 'টেবিল মেড ফলাফল' যা একসময় সামরিক শাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চর্চা হত। তার মানে ভোটের সংখ্যা যেটা দেখানো হয়েছে, সেটি জনগণ প্রদত্ত ভোট নয়। সেটি বানোয়াট সংখ্যা। বলা বাহুল্য, বামপন্থীরা যে ভোট পেয়েছেন, তাও সরকারের দেয়া একই 'টেবিল মেড' ফলাফল। সেখানে যত ভোট পেলেন তার চেয়ে বেশি পেতেন কি না, এর থেকেও বড় কথা হলো যা পেয়েছেন সেটাও সরকারেরই দেয়া। এ কারণেই নির্বাচন কমিশন এবার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল আলাদাভাবে ঘোষণা করেনি।

দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যাই বামপন্থীদের এই জায়গায় নিয়ে গেছে

অনেকে বলছেন, বিএনপি'র মতো বামপন্থীরাও ফ্যাসিবাদী সরকারের চেহারা উন্মোচন করার জন্য নির্বাচনে গেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগকে উন্মোচিত করতে বিএনপি নির্বাচনে যায়নি। দলগত বিবেচনা থেকেই নির্বাচনে গেছে, যা কারও কাছেই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু বামপন্থীরা কেন এ কাজ করলেন? সারাদেশে গণধিকৃত এ সরকারকে উন্মোচন করার বেশি কিছু বাকি ছিল কি? বাস্তবে তারা এই ফ্যাসিস্ট শক্তির অধীনে আয়োজিত নির্বাচনে অংশ নেবার ফলে গণআন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিটাকে আঘাত করলেন।

আর এটা করলেন এই কারণে যে, আন্দোলন করে এ সরকারকে মোকাবেলা করবেন – এমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের ছিল না। জনগণকে নিয়ে যেভাবে আন্দোলনের চেষ্টা করতে হয়, তা তারা করেননি। ম্যানেজ করে কীভাবে ভোটের শক্তি হিসেবে আসতে পারেন, সে চেষ্টাই করেছেন। সিপিবি-বাসদ কিছুদিন পূর্বেও ড. কামাল হোসেন, মাহমুদুর রহমান মান্না, আ.স.ম. রবদের নিয়ে বিকল্প হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেটা কোনো আন্দোলনকারী শক্তি হিসেবে বিকল্প নয়। এদের নিয়ে তারা কোনো আন্দোলনের ডাক দেননি। সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাস্তায় পড়ে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তারা একত্রিত হননি। এক হয়েছিলেন ভোটের জন্য। তারা বুঝেছিলেন, মানুষ দু'দলের উপরই অনেকটা আস্থা হারিয়েছে। ফলে একটা শূন্যতা চলছে রাজনীতিতে। ড. কামাল হোসেন, মাহমুদুর রহমান মান্নাদের নামধাম আছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার দিয়ে এই নাম এদেশের মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই তৈরি করেছে। একে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক এই শূন্যতার মাঝে তারা যদি ফাঁক দিয়ে কিছু একটা করতে পারেন, সে চেষ্টাই তারা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যানেজটা ঠিক ঠিক করে উঠতে পারেননি, 'সুবর্ণ সুযোগ' তাদের 'হাতছাড়া' হয়ে গেছে।

গণআন্দোলন করে, দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম, জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে পরিচিতি গড়ে উঠতে পারে। তা না হলে আরেকভাবে পরিচিতি গড়ে উঠতে পারে, যদি বুর্জোয়ারা পেছন থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আন্দোলন-সংগ্রাম করতে করতে, মানুষের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতে, অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে একটা দলকে, একটা ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী শক্তিকে মানুষ যেমনভাবে চিনে, তাকে বিশ্বাস করে – সেভাবে এগোনোর কোনো পরিকল্পনা সিপিবি-বাসদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তারা নিজেদের পরিচিত করার জন্য, তাদের ভাষায় 'দৃশ্যমান' হওয়ার জন্য, ভোটকেন্দ্রিক ঐক্য গড়ে তুলছেন। বুর্জোয়া দুই দলের অগ্রহণযোগ্যতার কারণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই সুযোগে তারা সামনে আসতে চান।

গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি আমাদের জোট গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সাথে আছেন। তিনি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন। বলা হচ্ছে যে, এবারের নির্বাচনে মিডিয়ায় প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি তৃতীয় স্থানে ছিলেন। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ-বিএনপির প্রার্থীর পরই তার প্রচার ছিল। তাদের বক্তব্য, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। এত মানুষ কেন জোনায়েদ সাকির পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন? জোনায়েদ সাকি তো বহুদিন ধরে বহু আন্দোলনের সাথে আছেন। সেসব ব্যাপারে তো তার পক্ষে এমন সাড়া দেখা যায়নি। এখন কি দেখে সাড়া দিচ্ছেন? গোটা বামপন্থী আন্দোলনে স্থবির অবস্থা। সেখানে সাকিরাও আছেন। সেটা শক্তিতে বাড়ল না, এমনকি সাকির প্রতি ভালবাসা থেকে বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়ল না, ব্যক্তিগতভাবে জোনায়েদ সাকির খুব নামধাম হলো, খুব প্রচার-প্রপাগান্ডা হলো। এর মাধ্যমে সমাজে বামপন্থী চিন্তার স্ফুরণ কতটুকু ঘটলো?

বামপন্থীরা কী করতে পারতেন?

নির্বাচনপূর্ব অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি কি ছিল একবার ভেবে দেখুন। সরকার অবৈধ, অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসার কারণে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। তার গায়ের জোরের শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ। আবার বিএনপি চরম প্রতিক্রিয়াশীল জামাতের হাত ধরে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চালিয়েছে। পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারা – এসবের জন্য তারাও সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে বুর্জোয়াদের নোংরামি-নষ্টামির রাজনীতি যত রকমভাবে, যত রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় – এসেছে। এ অবস্থায় বামপন্থীরা নির্বাচনের বিকল্প নয়, আন্দোলনের শক্তি হিসেবে হাজির হতে পারত। সরকার ও বিরোধী দল – দুয়েরই জনবিচ্ছিন্নতার জন্য এমন এক পরিবেশ ছিল। তখন বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ালে, সাহসী পদক্ষেপ নিলে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বামপন্থী ধারার সূচনা ঘটতে পারত।

আমরা দেশের সমস্ত শিক্ষিত সচেতন মানুষকে একটি কথা ভেবে দেখতে বলব। সেসময় দেশের পরিস্থিতিতে দুটো বিষয় পাশাপাশি ছিল। একটি হলো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য গণবিচ্ছিন্ন ফ্যাসিস্ট সরকার দ্বারা আরোপিত 'নির্বাচন', অপরদিকে বাস্তব অবস্থার মধ্যে আন্দোলনের সম্ভাবনা, সরকার ও বিরোধী দল দুটোকেই কোণঠাসা করে দেয়ার সুযোগ। একটি বামপন্থী দলের কোন্‌টি গ্রহণ করা উচিত?

বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি কারা?

আরেকটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটু বলে যেতে চাই। বামপন্থী পার্টি হবার ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার থাকতে হবে – বামপন্থী শক্তি তারাই যারা 'ক্লাস স্ট্রাগল' এবং 'মাস স্ট্রাগল'-এ বিশ্বাস করে, অর্থাৎ যারা গণআন্দোলনে ও শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করে। আবার আমরা যখন বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি বলি তখন গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে কাদের বোঝায়? গণতান্ত্রিক শক্তি মানেই হলো – তারা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের পাশাপাশি দর্শনগতভাবে সেক্যুলারিজমে বিশ্বাস করে এবং এদেশে সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসন তার বিরোধিতা করে। এভাবে পরিষ্কার করেই বামপন্থী কারা, গণতান্ত্রিক কারা – এ কথাটা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের দেশে লিবারেল ডেমোক্রেটিক যাদের বলা হচ্ছে তারা সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক শক্তিই না। এরা কোনো না কোনোভাবে বুর্জোয়ারা যে ধারার রাজনীতির প্রসার এদেশে ঘটাচ্ছে, সে একই ধারারই রাজনীতি করেন। ক্ষমতায় না থাকলে লোকে যেভাবে মিষ্টি কথা বলে, মানুষের মনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে – এরা তাই করছেন। তা না হলে সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপে বুর্জোয়া রাজনীতির সাথে তাদের কোনো পার্থক্য নেই। সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বুর্জোয়াদের এই অংশের কোনটির মধ্যে নেই বললেই চলে।

বর্তমান সময়ে বামপন্থীদের করণীয় কি হওয়া উচিত

এদেশের বামপন্থীরা সাধারণভাবে প্রতিবাদধর্মী কিছু মিছিল-মিটিং করেন, কিছু সাংস্কৃতিক কাজকর্মও করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে সম্পূর্ণ বামপন্থী গণতান্ত্রিক ধারায় গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজ ধারাবাহিকভাবে তারা করেননি। বুর্জোয়াদের পার্লামেন্টারি রাজনীতির ফাঁদেই তারা আটকে আছেন। এদেশে বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংঘর্ষ নিত্য চলছে। একটা বিপ্লবী আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে এবং তার চ্যালেঞ্জের সামনে বুর্জোয়ারা পড়ছে – এমন কোনো পরিস্থিতিই এদেশে কখনোই তৈরি হয়নি। এ অবস্থা থেকে বামপন্থী রাজনীতির উত্তরণ দরকার। বামপন্থীদের বুঝতে হবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, শোষিত-মেহনতি মানুষের মুক্তির আন্দোলনে তারাই একমাত্র ভরসাস্থল। এখনও নিজেদের ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে বিকল্প শ্রেণী সংগ্রামের শক্তি নিয়ে দাঁড়ান। সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যারা বিচ্ছিন্নভাবে আছেন, তারাও নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্দোলনের জন্য কাজ করুন। আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণই আমাদের পরস্পরকে ঐক্যবদ্ধ করবে।

[গত ২৯ এপ্রিল দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রদত্ত বক্তব্য সম্পাদিত করে প্রকাশ করা হল।]

ফ্যাসিস্টরা মানুষকে দাস বানাতে চায়

তাকে প্রতিহত করতে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

১৯৪১ সালের ৩ জুলাই মহান স্ট্যালিনের ঐতিহাসিক ভাষণ

[১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের ফ্যাসিস্ট জার্মান সেনাবাহিনীর ১৭০টি ডিভিশন (প্রায় ৩০ লক্ষ সেনা) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ১৯৩৯ সালে জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত অনাক্রমণ চুক্তি জার্মানি হেলায় দু'পা মাড়িয়ে যায়। অতর্কিত ভয়াবহ আক্রমণে জার্মান বাহিনী দ্রুত ঢুকে আসতে থাকে। ইতোমধ্যে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া জার্মান ফ্যাসিস্টদের সম্পূর্ণ পদানত, ব্রিটেন পর্যুদস্ত। দেশের এই গভীর বিপদকে কীভাবে সোভিয়েত লালফৌজ প্রতিরোধ করবে, সোভিয়েত জনগণের ভূমিকা কী হবে, শেষপর্যন্ত দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধ করা কি সম্ভব হবে? – এইসব প্রশ্ন যখন সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্বের জনগণকে আলোড়িত করছে, সে'সময় আক্রান্ত হওয়ার ১০ দিনের মাথায় ১৯৪১ সালের ৩ জুলাই মহান নেতা কমরেড জে ভি স্ট্যালিন সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসাবে এক বেতার ভাষণে দেশবাসীকে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তাঁর এই ভাষণ ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ, যার মর্মবস্তু, ভাষা ও উপস্থাপনা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কীভাবে এই ভাষণ গোটা সোভিয়েত জনগণকে আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা নিয়ে বহু কাহিনী ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। মানবসভ্যতাকে রক্ষার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের আত্মত্যাগ এক বিশ্বজনীন আবেদন নিয়ে সাহিত্যেরও বিষয় হয়েছে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো একটির পর একটি যখন হিটলার বাহিনীর কাছে পদানত হয়েছে, তখন মহান স্ট্যালিন তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, সোভিয়েত জনগণের দ্বারা জার্মান বাহিনী পরাজিত হবে। বহু অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে সোভিয়েত জনগণ নেতার এই আস্থা ও বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করেছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৭০ বছর উপলক্ষে স্ট্যালিনের এই ভাষণটি প্রকাশ করা হল। এটি নেয়া হয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক গণদাবী-র ১৫ মে '১৫ সংখ্যা থেকে।]

আমার দেশবাসী ভাইবোনেরা, নাগরিক ও কমরেডগণ, আমাদের সেনা ও নৌবাহিনীর যোদ্ধারা, আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যেই বলছি।

বিশ্বাসঘাতক হিটলারপন্থী জার্মানি আমাদের পিতৃভূমির উপর গত ২২ জুন যে সামরিক আক্রমণ শুরু করেছে তা এখনও চলছে। লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে পড়ে যদিও শত্রুসেনার শ্রেষ্ঠ ডিভিশনগুলি, সেরা বিমানবহর ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে তারা ব্যর্থতার মুখে পড়েছে, তবুও নতুন নতুন বাহিনীকে আক্রমণে এনে শত্রুরা আমাদের দেশের ভিতর ঢুকে আসছে।

হিটলার বাহিনী লিথুয়ানিয় দখল করতে সফল হয়েছে, লাতভিয়ার একটা বড় অংশ, পশ্চিম বেলারুশ ও ইউক্রেনের পশ্চিম অংশ দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট বিমানবহর আক্রমণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করেছে। মুর্মানস্ক, ওরশা, মগিলেভ, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ, ওডেসা ও সেবাস্তোপোলের ওপর তারা বোমাবর্ষণ করে চলেছে। দেশের সামনে আজ গভীর বিপদ। আমাদের মহান লালফৌজ থাকা সত্ত্বেও এতগুলি শহর এবং জেলা কীভাবে ফ্যাসিস্ট সেনার হাতে চলে গেল, কী করে এটা ঘটতে পারল? উদ্ধত ফ্যাসিস্ট বাহিনী সর্বদা সোচ্চারে যেটা প্রচার করে থাকে, তবে কি সেটাই সত্য? জার্মান বাহিনী কি সত্যই অপরাজেয়? না, তা অবশ্যই নয়।

ইতিহাস আমাদের দেখায় – কোনও সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়। অতীতেও ছিল না, এবং আজও নেই। নেপোলিয়ানের বাহিনীকে অপরাজেয় মনে করা হয়েছিল, কিন্তু রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও জার্মান সেনাবাহিনীর হাতে তাকে বার বার পরাজয় মানতে হয়েছিল। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কাইজার উইলহেলমের সেনাবাহিনীকে অপরাজেয় বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু তাকেও বার বার রুশ ও ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর হাতে পরাজিত হতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী তাকে ধ্বংস করে দেয়।

বর্তমানে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীরও একই পরিণতি ঘটবে। এখন ইউরোপের মাটিতে তারা কোনও দৃঢ় প্রতিরোধের সামনে পড়েনি। একমাত্র আমাদের দেশের মাটিতেই তাদের যথার্থ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে। এবং লালফৌজের এই প্রতিরোধের আঘাতে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সবচেয়ে সেরা ডিভিশনগুলিকে পরাজয় মানতে হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, এই সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করা সম্ভব এবং বাস্তবেও এদের দশা হবে নেপোলিয়ন এবং উইলহেলমের বাহিনীর মতোই। এসত্ত্বেও ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের খানিকটা জার্মানরা যে দখল করতে পেরেছে, তার কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময়টা ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে অনুকূল এবং সোভিয়েত শক্তির পক্ষে প্রতিকূল। বাস্তব ঘটনা হল, ইতিমধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত দেশ হিসাবে জার্মানি পূর্ণ সৈন্য সমাবেশ করেই রেখেছিল। আক্রমণ চালাবার জন্য যে ১৭০টি জার্মান ডিভিশনকে সোভিয়েত সীমান্তে নিয়ে আসা হয়, তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই তৈরিই ছিল, আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শুধু একটা সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিল। অথচ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর তখনও শক্তিসমাবেশ ঘটাতে ও সীমান্তে পৌঁছাতে বাকি ছিল। এ ক্ষেত্রে অপর একটি ঘটনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানি যে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই চুক্তি তারা লঙ্ঘন করেছে। এজন্য বিশ্বের চোখে জার্মানি হানাদার রূপে চিহ্নিত হবে একথা জেনেও চুক্তি লঙ্ঘন করতে তাদের আটকায়নি।

আমাদের দেশ শান্তি চায়, চুক্তি লঙ্ঘনে আমরা অগ্রণী হতে চাইনি, বিশ্বাসঘাতকতার পথে যাইনি। প্রশ্ন উঠতে পারে, হিটলার এবং রিবেনট্রপের মতো বিশ্বাসঘাতক শয়তানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে কেন সোভিয়েত সরকার মত দিয়েছিল? এটা কি সোভিয়েত সরকারের ভুল ছিল না? না, কখনই তা ভুল নয়। অনাক্রমণ চুক্তি হল দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি। ১৯৩৯ সালে এই চুক্তির প্রস্তাব জার্মানিই আমাদের দিয়েছিল।

সেই প্রস্তাব কি সোভিয়েত সরকার প্রত্যাখ্যান করতে পারত? আমি মনে করি, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব কোনও শান্তিকামী দেশই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, এমনকী প্রতিবেশী দেশের সরকারি ক্ষমতার শীর্ষে হিটলার ও রিবেনট্রপের মতো নরখাদক শয়তান থাকলেও নয়। এক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত একটাই, তা হল, চুক্তি কোনও মতেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শান্তিকামী দেশের ভৌগোলিক সংহতি, স্বাধীনতা ও সম্মানের হানি ঘটাবে না। সকলেই জানেন, সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এ ধরনেরই একটা চুক্তি।

জার্মানির সঙ্গে এই অনাক্রমণ চুক্তি করায় আমাদের লাভ কী হয়েছে? এর ফলে দেড় বছর আমরা শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে আক্রমণ চালাবার ঝুঁকি যদি ফ্যাসিস্ট জার্মানি নেয়, সেকথা ভেবে রেখে তা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ আমরা পেয়েছি। এভাবেই চুক্তির মধ্য দিয়ে কিছু নিশ্চিত সুবিধা আমরা পেয়েছি, যেটা বিপরীতে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে নিশ্চিত অসুবিধার কারণ হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতকের মতো চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে সোভিয়েত ইউনিয়নে হানাদারি চালিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানি কী লাভ করেছে এবং ক্ষতিই বা তার কী হয়েছে?

এর দ্বারা অল্পসময়ের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় নিজের সৈন্য সমাবেশের সুযোগ জার্মানি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু গোটা দুনিয়ার চোখে নিজের রক্তপিপাসু হানাদার চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সামরিক দিক থেকে জার্মানির লাভটুকু নেহাতই একটা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। অন্য দিকে যে বিরাট রাজনৈতিক লাভ সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী, যেটা ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগামী দিনে লালফৌজের সামরিক বিজয়ের জমি তৈরি করে দেবে।

এই কারণেই, আমাদের বীর লালফৌজ, আমাদের বীর নৌবাহিনী, আমাদের সদাতৎপর বিমানবাহিনীর সকলে, দেশের সমগ্র জনগণ, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার সুসন্তানেরা এবং জার্মানিরও শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ সকলে জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করছে। তারা সোভিয়েত সরকারের পাশে থাকছে, সোভিয়েত সরকারের আচরণকে সমর্থন করছে। তারা দেখছে, আমরা ন্যায়ের জন্য লড়ছি। তারা বুঝেছে – শত্রুর পরাজয় অনিবার্য, জয় আমাদের হবেই।

আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধের পরিণামে চরম সোভিয়েতবিদ্বেষী এবং চূড়ান্ত প্রতারক জার্মান ফ্যাসিবাদের মৃত্যুশীতল বজ্রমুষ্ঠির কবলে আমাদের দেশ পড়েছে। ট্যাঙ্ক এবং জঙ্গি বিমানে সুসজ্জিত ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনী অমিত শৌর্যের সঙ্গে লড়াই করছে। অসংখ্য প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বহু আত্মদানের মধ্য দিয়ে লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনী প্রতি ইঞ্চি সোভিয়েত ভূমির জন্য মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে। হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানে সজ্জিত লালফৌজের মূল শক্তি এখন যুদ্ধে নামছে। লালফৌজের সৈনিকরা বীরত্বের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করছে। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ সবদিক থেকে আরও জোরদার হচ্ছে।

লালফৌজের সাথে সাথে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ স্বদেশ রক্ষার আহ্বানে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেশের এই গভীর বিপদকে প্রতিহত করার জন্য, শত্রুকে পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য আমাদের কী কী করা দরকার?

সর্বাগ্রে আমাদের দেশের জনগণ, সোভিয়েত জনগণকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে দেশের সামনে বিপদ কত গভীর। সমস্ত আত্মসন্তুষ্টি, সবরকম অসতর্কতা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজের যে মানসিকতা, যা যুদ্ধের আগে স্বাভাবিক ছিল, তা পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ যুদ্ধ সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, এখন পূর্বেকার ঐ মানসিকতা পরাজয় ডেকে আনতে পারে।

শত্রু নির্মম এবং দুর্দম। তার লক্ষ্য – আমাদের দেশ দখল করা, আমাদের ঘামে ভেজা মাটি, আমাদের শস্য, আমাদের শ্রমে সৃষ্ট তৈলসম্পদ দখল করা। শত্রুর উদ্দেশ্য, সামন্তপ্রভুদের শাসন ফিরিয়ে আনা, আবার জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। রুশ, উক্রাইনীয়, বেলারুশ, লিথুয়ানীয়, লাতভীয়, এস্তোনীয়, উজবেক, তাতার, মোলডাভীয়, জর্জিয়, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য মুক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাধীন জাতীয় অস্তিত্বকে তারা ধ্বংস করতে চায়। তাদের জার্মানির অধীনস্ত করতে চায়, জার্মান ব্যারন ও প্রিন্সদের দাসে পরিণত করতে চায়।

কাজেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের কাছে এটা জীবনমরণ প্রশ্ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ স্বাধীন থাকবে, নাকি দাসত্বের জোয়ালে বাঁধা পড়বে – এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হবে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য সোভিয়েত জনগণকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে এবং সবরকম অসতর্কতা পরিহার করতে হবে, জনগণকে সমস্ত শক্তি সংহত করতে হবে, যুদ্ধকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে, শত্রুর প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্বের স্থান এখন নেই। কাপুরুষ, ভীতু, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এবং বেইমানদের কোনও স্থান আমাদের মধ্যে নেই। পিতৃভূমি রক্ষার এই যুদ্ধে ভয় কাকে বলে আমাদের জনগণকে তা ভুলতে হবে। যে ফ্যাসিস্টরা মানুষকে দাস বানাতে চায় তাদের হাত থেকে মুক্তির যুদ্ধে নিজেদের সর্বস্ব দেওয়ার মন নিয়ে জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান লেনিন বলতেন – সাহস, শৌর্য, সংগ্রামে নির্ভীকতা, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সদা তৈরি মন – এগুলিই হল বলশেভিকদের শ্রেষ্ঠ গুণ।

বলশেভিকদের এই অসামান্য গুণাবলীকে এখন লক্ষ লক্ষ লালফৌজ, লাল নৌসেনা এবং সোভিয়েত জনগণের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডকে এখন যুদ্ধকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য যা প্রয়োজন এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য যা প্রয়োজন – সেটাই এখন মুখ্য, বাকি সব প্রয়োজনকে গৌণ করে ফেলতে হবে। আমাদের মতো দেশ, যে দেশ সকল মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে, সেই দেশের প্রতি জার্মান ফ্যাসিস্টদের বর্বর ক্রোধ ও ঘৃণা যে কোনও মতেই প্রশমিত হওয়ার নয় – সোভিয়েত জনগণ এখন তা পরিষ্কারভাবে বুঝেছে।

এই শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে দৃঢ়প্রত্যয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। নিজেদের অধিকার ও নিজেদের দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হবে। লালফৌজ, লাল নৌবাহিনী, সোভিয়েতের প্রতিটি মানুষ সোভিয়েত ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার জন্য লড়বে, আমাদের গ্রাম ও শহরগুলি রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেবে। আমাদের জনগণের শিরায় শিরায় বইছে যে দুঃসাহসী উদ্যোগ ও বুদ্ধিমত্তা, তার প্রকাশ ঘটাবে।

লালফৌজের পাশে আমাদের সমস্ত সহায়সম্বল নিয়ে দাঁড়াতে হবে, লালফৌজের যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের জায়গা দ্রুত নতুন নতুন মানুষ দিয়ে ভরে দিতে হবে, ফৌজের যা প্রয়োজন তার সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সেনা, রসদ ও যুদ্ধসরঞ্জাম এবং আহতদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

লালফৌজের পৃষ্ঠভূমি রক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং এই কাজের কাছে বাকি সব গৌণ করে ফেলতে হবে। আমাদের সমস্ত শিল্প-কারখানায় আরও কঠোর শ্রম দিয়ে আরও বেশি রাইফেল, মেশিনগান, কামান, বুলেট, গোলা, বিমান তৈরি করতে হবে; কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে হবে, সমস্ত এলাকায় বিমান আক্রমাণ থেকে রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদভূমিতে যারা অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে, যারা পলাতক, গুজব ছড়িয়ে যারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। গুপ্তচর, বিভেদপন্থী ও শত্রুর ছত্রীসেনাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সরাসরি শত্রুসংহারে লিপ্ত সেনা ব্যাটেলিয়নগুলিকে সবরকম সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে, শত্রু অত্যন্ত ধূর্ত, নীতিহীন এবং প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারে অভিজ্ঞ। এটা সবসময় খেয়ালে রাখতে হবে এবং প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না।

আতঙ্ক ছড়িয়ে বা কাপুরুষতার জন্য যারাই প্রতিরক্ষার কাজ ব্যাহত করবে – তারা যে-ই হোক – তৎক্ষণাৎ তাদের সামরিক ট্রাইবুনালের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। কোথাও লালফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে, সেখান থেকে সমস্ত ধরনের যানবাহন সরিয়ে নিতে হবে, যাতে একটিও রেলইঞ্জিন, একটিও রেলগাড়ি শত্রুর হাতে না পড়ে, এক পাউন্ড শস্য, এ গ্যালন পেট্রলও যেন তারা না পায়।

যৌথ খামারের চাষীরা অবিলম্বে সমস্ত গবাদি পশু সরিয়ে দিন এবং সমস্ত ফসল ফ্রন্টের পিছনে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিন। ধাতু, শস্য এবং জ্বালানি তেলসহ সমস্ত সম্পদ যা সরানো যাবে না, তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর অন্যথা যেন কোনও মতেই না হয়। শত্রু কবলিত এলাকায় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক গেরিলা বাহিনী অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্য, শত্রুকে ভুল পথে চালনা করার জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। সর্বত্র গেরিলা হামলা চালিয়ে যেতে হবে। সেতু, রাস্তা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন উড়িয়ে দিতে হবে। অরণ্য, গুদাম, যানবাহন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শত্রুকবলিত এলাকায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শত্রু ও তার সহযোগীরা সেখানে তিষ্ঠাতে না পারে। পদে পদে তাদের ঘেরাও করে মেরে শেষ করে দিতে হবে। শত্রুর সমস্ত কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে হবে।

ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে এই যুদ্ধ একটা সামান্য যুদ্ধ নয়। এটা কেবলমাত্র দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের যুদ্ধ।

ফ্যাসিস্ট উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে জড়িত করে আমাদের এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশের সামনে দেখা দেওয়া গভীর বিপদ দূর করাই নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদী জাঁতাকলে পিষ্ট সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাও আমাদের লক্ষ্য।

এই মুক্তিসংগ্রামে আমরা একা নই। ইউরোপ, আমেরিকার জনগণ, এমনকি হিটলারি স্বৈরাচারীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ জার্মান জনগণের মধ্য থেকেও আমরা বিশ্বস্ত মিত্র পাব। আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের এই যুদ্ধ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই অঙ্গাঙ্গীভাবে এক হয়ে আছে। এটা হবে জনগণের এক যুক্তফ্রন্ট, যা দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং হিটলারি ফ্যাসিস্ট সেনার হাতে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ার বিপদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়বে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের এবং আমেরিকার ঘোষণার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায়। এই সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা সোভিয়েত জনগণের মধ্যে কৃতজ্ঞতা জাগিয়েছে।

কমরেডস, আমাদের শক্তি অপরিমেয়। এ সত্যটা অচিরেই গর্বোদ্ধত শত্রুপক্ষ বহু মূল্য দিয়ে বুঝতে পারবে। আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে লালফৌজের পাশে দাঁড়াতে বহু হাজার শ্রমিক, যৌথ খামারের কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসছে। সোভিয়েতের আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাশক্তি রূপে জেগে উঠবে।

মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে মেহনতি মানুষ ইতিমধ্যেই লালফৌজের সাহায্যের জন্য জনগণের দানে এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। শত্রুর হানাদারির সম্মুখীন এমন সমস্ত শহরেই জনগণের দানে এমন ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে আমাদের দেশ, আমাদের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, সমস্ত মেহনতি মানুষকে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মানব পাচারকারী রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী চক্রের বিচার ও শাস্তির দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

৮ মে '১৫ বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিদেশে পাঠানোর নামে মানব পাচারকারী রাজনৈতিক-ব্যাবসায়ী-সন্ত্রাসী চক্রের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায় ও ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রশাসনের নাকের ডগায় দীর্ঘদীন ধরে অসহায় কর্মহীন মানুষকে প্রলুব্ধ করে পাচারের মাধ্যমে একদিকে দাসব্যবসা, অন্যদিকে মুক্তিপণ আদায় ও হত্যা চললেও সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রকার ব্যবস্থা না নেয়াও বাস্তবে এসব নিষ্ঠুরতম অন্যায়কারীদের মদদ দেয়ার সামিল। সম্পূর্ণভাবে সরকারকেই এর দায়-দয়িত্ব নিতে হবে। যেসকল পরিবার স্বজনদের হারিয়েছে তাদের খুঁজে বের করে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এবং দেশের সচেতন মানুষদের মানব পাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, এ ঘটনা প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত মুনাফালোভী চরিত্রকে আরো একবার উন্মোচন করলো। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম জোরদার করার মাধ্যমে একে মোকাবেলা করতে হবে। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও ক্ষতিগ্রস্ত চাষী-জেলেদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নীলফামারীতে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

ভারতের কাছ থেকে তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত চাষী ও মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ২০ এপ্রিল বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও পরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে একইদিনে উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ, অবরোধ, মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড কমরেড মানস নন্দী, কমরেড ওবায়দুল্লাহ মুসা, কমরেড উজ্জ্বল রায়, কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন-গুলিস্তান-বায়তুল মোকাররম এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, তিস্তা নদীতে পানি নেই, ধু-ধু বালুচর। পানিহীন শুকনো সেচখাল। তিস্তায় পানি না থাকায় হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে, মাটির নিচে পানির স্তর আরো নিচে নেমে গেছে। বর্ষাকালে নদীভাঙন ও বন্যার কবলে পড়ে হাজার হাজার হেক্টর জমি নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। তিস্তায় পানি-শূন্যতা ও নদীভাঙনসহ নানা কারণে নদী তীরবর্তী চাষী-মৎস্যজীবীরা এক হিসাবে কমপক্ষে ১২শ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন এবং নদীর পানির হিস্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণ, দ্রব্যমূল্য, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস প্রভৃতি জনজীবনের সমস্যা নিয়ে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

'চা শ্রমিক দিবস' উদযাপন

২০ মে 'চা শ্রমিক দিবস'-এর ৯৪তম বার্ষিকী। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার উদ্যোগে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে সকাল ৮টায় বাগানে বাগানে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শহীদ স্মরণে কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। সিলেট অঞ্চলের মালনীছড়া, লাক্কাতুরা, হিলুয়াছড়া,দলদলি, তারাপুরসহ বিভিন্ন চা বাগানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এদিকে বিকাল ৪টায় মালনীছড়া চা বাগানে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফেডারেশনের সিলেট জেলার আহবায়ক বীরেন সিং-এর সভপতিত্বে এবং অজিত দাশের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন জেলা সভাপতি সুশান্ত সিনহা, চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি, মিতা সিং, মালনীছড়া বাগানের সভাপতি সন্তোষ নায়েক, লাক্কাতুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক লাংকাট লোহার, চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের অধীর বাউরী, আমেনা বেগম, আসা সবর প্রমুখ। সবশেষে 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

একই দিনে হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন বাগানে অস্থায়ী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে চা শ্রমিক ফেডারেশন নেতা ময়না রবি দাসের সভাপতিত্বে এবং শ্রমিক নেতা শিবলাল এর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুধরাম সাওতাল, গণেশ দাস, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা এনামুল হক প্রমুখ।

মহান মে দিবস উদযাপন

কাজ, ন্যায্য মজুরি ও ট্রেডইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হোন

শ্রমশোষণের নিগড় থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে মহান মে দিবস পালন করল বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন। ১ মে সকাল ১০টায় প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও লাল পতাকা নিয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট মোড়, পল্টন, মুক্তাঙ্গন, জিরো পয়েন্ট, বায়তুল মোকাররম ঘুরে তোপখানা রোডের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। এখানে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা ডা. মুজিবুল হক আরজু। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ মে দিবসের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, মে দিবসের সংগ্রামী চেতনাকে মালিকশ্রেণী উৎসবের ডামাডোলের নিচে চাপা দিতে চাইছে। আজ শ্রমিকদের এমন মজুরি দেয়া হয় যা দিয়ে জীবনধারণ করা যায় না। ফলে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা নিজেরাই ওভারটাইম দাবি করে। নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ নেই। রানা প্লাজা, তাজরিন প্রভৃতি শ্রমিক গণহত্যার বিচার আজও হয়নি। নেতৃবৃন্দ বলেন, মে দিবসের ইতিহাসের সাথে দুটি বিষয় গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটি হল, শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব – রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব। অপরটি হল, শ্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। মে দিবসের ইতিহাস তুলে ধরে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এ লক্ষ্য বার বার তুলে ধরতে হবে।

মহান মে দিবসে বিকালে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সূত্রাপুর থানা শাখার উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সংগঠক রাজীব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ছাত্রনেতা কৃষ্ণ বর্মনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক, বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড সাইফুজ্জামান সাকন, ছাত্রনেতা মাসুদ রানা, বাঁধাই শ্রমিক মানিক হোসেন, জামিল হোসেন। সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

রানাপ-াজা শ্রমিক গণহত্যা দিবস স্মরণ

রানা প-াজা শ্রমিক গণহত্যা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় সাভারস্থ রানা প-াজা ধ্বংসস্তূপের সামনে অস্থায়ী শহীদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলাম, প্রকৌশলী হারুন আল রশীদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু প্রমুখ। এছাড়া, রানা প-াজা ও তাজরিন ফ্যাশন্সে শ্রমিক হত্যার জন্য দায়ীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ এবং অবাধ ট্রেডইউনিয়ন অধিকার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের দাবিতে সংগঠনের উদ্যোগে এদিন সকাল ১০টায় গাজীপুর চৌরাস্তায় এবং বিকাল ৫টায় মীরপুর ১১নং পূরবী সিনেমা হলের সামনে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মিরপুর-পল্লবী : বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন মিরপুর-পল-বী আঞ্চলিক শাখা ২৪ এপ্রিল বিকালে রানাপ-াজা শ্রমিক গণহত্যা দিবস স্মরণে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মিছিলের আয়োজন করে। বিকাল ৪টায় পল-বীস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে কালো ব্যাজ ধারণ এবং নিরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সংগঠক ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক এবং মিরপুর পল-বী আঞ্চলিক শাখার সংগঠক ডা. মুজিবুল হক আরজু। আলোচনা শেষে একটি মিছিল পূরবী হলের সামনে যায় এবং সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডা. আরজুর সভাপতিত্বে এবং সাইফুল হাসান মুনাকাতের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, মাহবুব হাসান এবং তাজুল ইসলাম। সমাবেশ শেষে মিছিল মিরপুর ১২ নাম্বারের চৌরঙ্গী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

গাজীপুর : বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সকাল ১০টায় গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে সমাবেশ চলাকালে পুলিশ বাধা দেয়। নারীনেত্রী এড. ফরিদা ইয়াছমিন ও গার্মেন্টস শ্রমিক নেত্রী জনতা রানীর বক্তব্য শেষ করার পর পুলিশ বাধা প্রদান করে অনুমতির অজুহাতে। এ সময় শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ শে-াগান দিলে পুলিশ ব্যানার ছিনিয়ে নেয় এবং মাইক ছিনিয়ে নেয়ার জন্য টানাটানি করে। পরে সাম্যবাদ কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) গাজীপুর জেলা সমন্বয়ক তরুণ কান্তি বর্মন ও ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি মশিউর রহমান খোকন।

তেজগাঁও : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে রানাপ্লাজা শ্রমিক গণহত্যার বিচার, আহত-নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ এবং পহেলা বৈশাখে বিভিন্ন স্থানে নারী লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে ২৪ এপ্রিল বিকাল ৫টায় নাবিস্কো মোড়ে মানববন্ধন ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের মাহফুজা খানম রিতা।

বাঁধাই শ্রমিকদের সমাবেশ

বাঁধাই শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১২ হাজার টাকা, নিয়োগপত্র, সবেতনে সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি, ওভার টাইম, গ্রাচ্যুইটি-প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুস্থ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন-এর উদ্যোগে ১০ এপ্রিল বিকাল ৪.৩০টায় প্রেসক্লাব চত্বরে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সংগঠক রাজীব চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা নগর নেতা কল্যাণ দত্ত, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা মাসুদ রানা, বাঁধাই শ্রমিক খোকন মিয়া, মানিক মিয়া, আলতাব হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বাধাঁই শ্রমিকরা বলেন, আমরা পুরান ঢাকার বিভিন্ন বিল্ডিং-এর নিচতলায় আলো-বাতাসহীন ঘুপচি ঘরগুলোতে সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পযন্ত কাজ করি। বই ছাপার মৌসুমে রাত ২টা-৩টা এমনকি ৪টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। কিন্তু এরপরও বাঁচার মতো মজুরি পাই না। একটা বাথরুম, একটা রান্নাঘর তৈরি করে ২০/২৫ জন শ্রমিক নিয়ে কারখানায় কাজ চলে। গায়ে চুলকানি, খুসখুসে কাশি আমাদের নৈমিত্তিক সঙ্গী।

সমাবেশে শ্রমিক নেতারা আরো বলেন, ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শত বছর থেকে আন্দোলন চললেও, আজও বাঁধাই শ্রমিকরা ১৫ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য। আবার আগামী জুলাই মাস থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে সরকারি পে-কমিশন। তার সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য বাড়বে, বাড়বে গাড়ি ভাড়া-বাড়ি ভাড়া। বছরের শুরুতে গ্যাস বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির জন্য একবার সব কিছুর দাম বাড়ে, আবার পে-কমিশনের পর আবার বাড়বে। এমতাবস্থায়, কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবি মানুষের দাবি আদায় করতে হবে।

ছাত্র ফ্রন্টের নবীনবরণ

ইডেন কলেজ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল সকালে কলেজ অডিটোরিয়ামে ২০১৪-'১৫ বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌফিকা দেওয়ান লিজা, আলোচনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, ঢাকা নগর শাখার সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভার শেষে নবীনদের অংশগ্রহণে গান, কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গীতিআলোখ্য ও নাটক পরিবেশিত হয়। নবীনবরণ অনুষ্ঠান থেকে জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ, ২১০ দিন ক্লাস চালু রাখা, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং ইডেনকে সায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার এবং বীরকন্যা প্রীতিলতার নামে নামকরণ করার দাবি জানানো হয়।

আনন্দ মোহন কলেজ

২০ মে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে আনন্দমোহন কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতির পরিপূরক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনসহ ৯ দফা দাবিতে নবীনদের অংশগ্রহণে সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। পরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) ময়মনসিংহ জেলা সমন্বয়ক শেখর রায়, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সেঁজুতি চৌধুরী, সংগঠনের ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস, বাকৃবি সহ-সভাপতি রাফিকুজ্জামান ফরিদ, আনন্দমহন সংগঠক সাজিদ, নবীন ছাত্র জুয়েল। আনন্দমোহন শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর ভুঁইয়ার পরিচালনায় সভাপতিত্ব করেন আহবায়ক মিশুক দত্ত। এরপর নবীনদের অংশগ্রহণে স্কাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক গর্ত পরিবেশিত হয়।

স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল নির্মাণ করার দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের অবস্থান কর্মসূচি

২১ মে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল নির্মাণ করে সারা বছর ক্লাস চালু রাখার দাবিতে পৌর শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি পরমানন্দ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, শামীম আর মিনা, জাহেদা বেগম রাহেলা সিদ্দিকা, মাহবুব আলম মিলন। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক হেদায়েতুল ইসলাম বাবু। বক্তাগণ বলেন পরীক্ষার কারণে কলেজগুলো বছরের অধিকাংশ সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। ফলে স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল নির্মাণ ছাত্রসমাজের প্রাণের দাবি।

খাগড়াছড়িতে বাংলা নববর্ষ ও বৈসাবি উৎসব পালন

বাংলা নববর্ষ ও বৈসাবি উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে শিশু কিশোর মেলা এর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও চিত্রাংকনের প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। নতুন বৎসরকে স্বাগত জানাতে ১২ এপ্রিল সকাল ১০টায় রং বেরং এর ফেস্টুন নিয়ে বর্ণ্যাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি শিশু কিশোর মেলার কার্যালয় থেকে শাপলা চত্বর, শান্তি নগর মোড় ঘুরে এসে আবার শিশু কিশোর মেলার কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এরপর চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা শুরু হয় শরৎ স্মৃতি পাঠাগারে। পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আইনস্টাইন স্মরণে আলোচনা সভা

বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টস-এর ৬০ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ১৫ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংগঠক আবু নাঈম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক ইভা মজুমদার ও নূরে আলম সিদ্দিকী।

ধান-গম-ভূট্টার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং মানব পাচারকারী চক্রের শাস্তির দাবিতে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ধান, গম ও ভূট্টার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দাবিতে ও দেশে পর্যাপ্ত মজুত থাকার পরও ভারত থেকে শুল্কমুক্ত চাল আমদানির প্রতিবাদে এবং থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ায় মানব পাচার-হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ১৬ মে ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিকাল ৪.৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাম মোর্চার সমন্বয়ক গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণসংহতি আন্দোলনের এড. আবদুস সালাম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বহ্নিশিখা জামালি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ(মাহবুব) নেতা মহিনউদ্দিন লিটন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ধানের বাম্পার ফলন ফলিয়েও কৃষকের ঘরে আজ আহাজারি চলছে। বাজারে ধান-ভুট্টার দাম এতই কম যে, লাভ তো দূরের কথা উৎপাদন খরচের চাইতে মনপ্রতি ২০০ টাকা লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে। সরকারের মূল্য নির্ধারণ ও ধান ক্রয়ের ঘোষণা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। একদিকে কৃষককে চড়া দামে সার-বীজ-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ কিনতে হয়, অপরদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে হতে হয় বঞ্চিত। এভাবে ক্রমাগত সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশে পাঠানোর নামে থাইল্যান্ডে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের সাথে জড়িত মানব পাচারকারী রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী চক্রের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানিয়ে বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ বলেন, সম্পূর্ণভাবে সরকারকেই এর দায়-দয়িত্ব নিতে হবে। নেতৃবৃন্দ সাগরে ভাসমান বিপন্ন বাংলাদেশীদের আশ্রয় দিতে থাইল্যাণ্ড-মালেশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সরকারকে অনুরোধ জানাতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নারী লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ঘটনা। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, লাঞ্ছনা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। নিভৃত গ্রামে, শহরের বস্তিতে, নির্জন গলিতে যেমন তেমনি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নারী নির্যাতন, নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটছে। বখাটে মাস্তান আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সবাই নির্যাতকের চরিত্রে। সমাজের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ে ঘুঁচে গেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান।

খুলনায় ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত মানববন্ধনে ছাত্র ফ্রন্ট

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার নামে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে নারীকে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে টেনে এনেছে সস্তা শ্রমের যোগান দেবার জন্য। মুনাফার উদগ্র লালসায় নারীকে নগ্ন করেছে, নারীর দেহ-সৌন্দর্য্য সমস্ত কিছুকে পণ্য করেছে। ভোগবাদের বিস্তারে নারী হয়েছে পুঁজির অন্যতম কাঁচামাল। আর পুঁজিবাদী মিডিয়া অত্যন্ত সুকৌশলে নারীকে পণ্য করার কাজটি করে চলেছে। নর-নারী নির্বিশেষে পুরো সমাজমননে নিকৃষ্ট ভোগবাদের পঁচাগলা আবর্জনাগুলো প্রবেশ করাচ্ছে। পুরুষদের শেখাচ্ছে – নারী মাত্রই ভোগের সামগ্রী, আর নারীদের শেখাচ্ছে – নিজেকে ভোগের উপযুক্ত করে তোল, বাজার দর বাড়াও। এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্বৃত্তায়িত ও নিকৃষ্ট দলবাজীর রাজনীতি। নারী নির্যাতন ও লাঞ্ছনার ঘটনার সাথে জড়িতরা দলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে পার পেয়ে যায়, থেকে যায় বিচারের আড়ালে। এভাবে বিচারহীনতা অপরাধের মাত্রাকেই দিন দিন বাড়িয়ে চলে।

তবে আশার কথা, বর্ষবরণের যৌন নিপীড়নের ঘটনা যেমন ঘটেছে তেমনি এর বিপরীতে কিছু সাহসী তরুণ ছাত্র-যুবক এই ঘটনাকে প্রতিহত করার সৎ সাহস দেখিয়েছে। নারী লাঞ্ছনা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি লিটন নন্দীসহ কয়েকজন নেতা-কর্মী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ন্যাক্কারজনক এসব ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলন চলমান আছে।

প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য এই দুই জোট মিলিতভাবে ৫টি দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী নির্যাতনের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার, নিষ্ক্রিয় পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরের অপসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়ী যৌন নিপীড়কদের আজীবন বহিষ্কার এবং সকলক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও পণ্য হিসেবে উপস্থাপন বন্ধ করার দাবিতে ধারাবাহিক মিছিল-সমাবেশ, সংহতি সমাবেশ, উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। একপর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়নের ডিএমপি কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা করলে তার প্রতিবাদে ১২ মে সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পরবর্তীতে ১৭ মে রবিবার বিকাল ৪টায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংহতি সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২০ মে পূর্ব ঘোষিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হয়। এ সময় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারেক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম সোহেল, ছাত্র গণমঞ্চের আহ্বায়ক শান্তনু সুমন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি এস এম পারভেজ লেলিন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি ফয়সাল ফারুক অভি, ছাত্র ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক সরকার আল ইমরান, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সালমান রহমান, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক জাকি সুমন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা থুইক্য চিং মারমা।

নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে জবি-তে আন্দোলনের বিজয়

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে ছাত্রী লাঞ্ছনাকারী হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন-এর অপসারণ এবং শিক্ষিকা লাঞ্ছনাকারী ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র আরজ মিয়ার ছাত্রত্ব বাতিল করে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে ৩ মে বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্য চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ ও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জবি শাখার সভাপতি মাসুদ রানা, পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মেহরাব আজাদ। আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রী চক্রবর্তী রিন্টু। উল্লেখ্য যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে প্রশাসন শিক্ষিক লাঞ্ছনাকারী ছাত্রলীগ নেতাকে আজীবন বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়।

নড়াইলে গৃহবধু নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নড়াইলে গৃহবধু নির্যাতককারী আজিজুরসহ সকল আসামীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৩ মে বিকাল ৪টায় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সীমা দত্ত । বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, ঢাকা নগর শাখার সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি ও সাধারণ সম্পাদক তাছলিমা নাজনিন সুরভী।

বক্তারা বলেন, গত ৩০ এপ্রিল নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের শালবরাত গ্রামের গৃহবধু ববিতা খানমকে লম্পট স্বামী শফিকুল ইসলাম গাছের সাথে বেঁধে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করেছে। ববিতা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই নির্যাতনে নেতৃত্ব দিয়েছে কাশিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক ও স্থানীয় মাতব্বর আজিজুর রহমান। মূল আসামী শফিকুল গ্রেফতার হলেও ঐ নির্যাতনে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক আজিজুর রহমানকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। নেতৃবৃন্দ, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে শিশু নিপীড়নকারীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

মোহম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিশু নিপীড়নকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ভাইস প্রিন্সিপালের অব্যাহতির আদেশ দ্রুত কার্যকর করা এবং শিক্ষাঙ্গনে নিরাপদ পরিবেশের দাবিতে ১৭ মে বিকেল ৪টায় নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে স্কুলের সামনে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে ও মনিদীপা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় মানববন্ধন ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নাঈমা খালেদ মনিকা, জান্নাতুল মাওয়া, অভিভাবক লাভলী বেগম, আয়াতুন নেসা, সোহেল, সম্পা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ৫ মে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীকে মুখ চেপে ধরে ঐ স্কুলের ক্যান্টিন বয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং এর দুইদিন পর ৫ম শ্রেণীর শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। কর্তৃপক্ষ দোষিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে শুধু সময় ক্ষেপণ করছে যা খুবই ন্যাক্কারজনক। অপরাধীদের শাস্তির আওতায় না আনায় এরকম জঘন্য অপরাধের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে । এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও চলন্ত বাসেও নারীরা নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তাই এর বিরুদ্ধে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একই দাবিতে ২২ মে বিকেলে প্রিপারেটরি স্কুলের সামনে নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে মানববন্ধন ও মোহাম্মদপুর টাউন হলের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পেশ এবং ২০ মে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত কৃষক-ক্ষেতমজুর সমাবেশ শেষে কৃষি ও কৃষককে রক্ষায় মিছিল সহকারে কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আলমগীর হোসেন দুলাল, আহসানুল হাবিব সাঈদ ও মনজুর আলম মিঠু।

রংপুরের সাতমাথায় রাস্তায় ধান ঢেলে বিক্ষোভ

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'পুঁজিবাদী শোষণ যত তীব্র হচ্ছে ততই এদেশের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের জীবন-জীবিকাসহ কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা, অসাধু ব্যবসায়ী-রাজনীতিক চক্রের কবলে পড়ে কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আজ সর্বস্বান্ত। একই সাথে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির কাছে তাদের নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে। শোষণমূলক এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের কৃষি-কৃষক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আজ বহুমুখী সংকটে জর্জরিত। রাষ্ট্রীয়ভাবেও যে কৃষিখাতকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেয়া হয় না, প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটে। একদিকে কৃষককে চড়া দামে সার-বীজ-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ কিনতে হয়, অপরদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে হতে হয় বঞ্চিত। ফলে কৃষক একবার কিনতে ঠকে, আরেকবার বেচতে ঠকে। এভাবে ক্রমাগত সে সর্বস্বান্ত হয়। এছাড়া ভূমিহীন-ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আরো নাজুক। সারাবছর কাজের কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী, দারিদ্র্যের কষাঘাতে তারা জর্জরিত। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সারাবছরের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানও রাষ্ট্রের

ধানের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ-অবরোধ

জরুরি দায়িত্ব। এ জন্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান করার দাবি দীর্ঘ দিনের।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জোর দাবি জানান এবং সাথে সাথে কৃষক ও কৃষি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে রক্ষার দাবিতে জনগণকে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে একটি প্রতিনিধি দল কৃষি মন্ত্রণালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে।

সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

২০ মে ধান-গম-ভুট্টাসহ কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত ও সরকারি উদ্যোগে হাটে হাটে ক্রয় কেন্দ্র খুলে ধানসহ কৃষি ফসল ক্রয় করা, গ্রামীণ গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য আর্মি রেটে রেশন এবং উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দ করে কৃষকদের জন্য সরাসরি ভর্তুকি প্রদান ও সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনের খরচ কমানোর দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্নস্থানে ধান সড়কে ফেলে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ মে সকাল ১১টায় রংপুর নগরীর সাতমাথায় চাষীদের অবরোধে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। কৃষক ফ্রন্টের জেলা সংগঠক ও বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে অবরোধ পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ, বাবু মিয়া, নুর ইসলাম, ক্ষতিগ্রস্ত চাষী বাদশা মিয়া প্রমুখ।

গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে বেলা ১২টায় উপজেলার দারিয়াপুর হাটে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিক্ষুব্ধ কৃষকরা ধান ও ভুট্টা রাস্তায় ফেলে দিয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং ধান-ভুট্টার বস্তা দিয়ে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখে। এখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ (মার্কসবাদী) আহবায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব

ফরিদগঞ্জে মানববন্ধন

সাঈদ সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু, গিদারী ইউপি চেয়ারম্যান প্রভাষক গোলাম ছাদেক লেবু।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সকাল ১১টায় স্থানীয় শহীদ মিনারের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল ফরিদগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল, ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদস্য সচিব জিএম বাদশা, মৎস্যজীবি সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা আব্দুল ওয়াদুদ, ফারুক আহম্মেদ পাটওয়ারী, জাহাঙ্গীর হোসেন ও মৎস্যজীবি নুরুল ইসলাম কুট্টি প্রমুখ।

বাঁশখালীতে উপজেলা সদরে মিছিল, সমাবেশ ও ইউএনও-র মাধ্যমে ডিসিকে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়। ঠাকুরগাঁওয়ে শহরের চৌরাস্তার মোড়ে শতাধিক কৃষকের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া মিছিল সমাবেশ হয়েছে বগুড়া, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জের গোবিন্দপুর, বাকচান্দা ও গাঙগাটি বাজার-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

বগুড়ায় সমাবেশ পূর্ব বিক্ষোভ মিছিল

এসব বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এ বছর প্রতি মন ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে ৭০০-৭৫০ টাকা। অথচ বর্তমানে কৃষকদের বাধ্য হয়ে ৪০০-৪৫০ টাকায় প্রতি মন ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। সরকার মন প্রতি ৮৮০ টাকা ধানের মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয়ের ঘোষণা দিলেও কোথাও কোনো ধান ক্রয় করেনি। ফলে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কৃষকরা। অন্যদিকে ক্ষেতমজুরদের বছরে ৯ মাস কোনো কাজ থাকে না। ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামালের উৎস কৃষি। অথচ প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয় এই কৃষি খাত। এখানে বাজেট বরাদ্দ এতই সামান্য যা এই খাতের সঙ্গে যুক্ত বিশাল জনগোষ্ঠির সঙ্গে তামাশা করার সামিল।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরকার ঘোষিত মূল্যে ধান ক্রয়, সকল বয়স্ক বিধবা প্রতিবন্ধী ও অসহায় নারীদের নুন্যতম ৩ হাজার টাকা মাসিক ভাতা প্রদান, অপসংস্কৃতি-অশ-ীলতা, যাত্রার নামে অশ-ীল নৃত্য, মাদক জুয়া হাউজি বন্ধে কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং মানব পাচার চক্রের বিচারের দাবি জানান।

মালয়েশিয়ান মডেল : বেশি শোষণ কম অধিকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রচার করছেন।

আর এক্ষেত্রে তারা মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের উদাহরণ সামনে নিয়ে আসছেন। যে সব দেশ দীর্ঘদিন সামরিক সরকার বা একদলীয় সরকারের অধীন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও সেই অভিলাষ উচ্চারিত হয়েছে, 'মালয়েশিয়ায় মাহাথির মোহাম্মদ যে পথে এগিয়ে গেছেন, বাংলাদেশেও শেখ হাসিনা সে পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই গণতন্ত্র আমরা মেনে চলব।' পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ায় একটানা ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং ১৩টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত যে ফ্রন্টকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, এখনো সেই ফ্রন্টের শাসন অব্যাহত আছে। তথাকথিত উন্নয়নের মালয়েশিয়ান মডেল যদি এখানে প্রয়োগ করা হয় তার সহজ মানে দাঁড়াচ্ছে, ৫ জানুয়ারি এখানে গণতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ তারও কবর খুঁড়ে যে একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে তা দীর্ঘতর হবে, সহজে এই ফ্যাসিবাদী সরকারের নাগপাশ থেকে জনগণের মুক্তি নেই। কেন এই পরিণতি?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রথমে বোঝা দরকার, উন্নয়নের মালয়েশিয়ান মডেল কি, বাংলাদেশেই বা শাসকদের এর দরকার কেন? মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রণালয়ের মহাসচিব মোহাম্মদ ইরওয়ান সেরিগার আবদুল্লাহর সাক্ষাতকারের একটি ছোট্ট কথায় মালয়েশিয়ান মডেলের মূল কথাটি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'একটি বড় গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে দেশটির অর্থনীতিতে। মালয়েশিয়া একটি সরকারি ব্যবস্থাপনাভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বেসরকারি খাত নির্ভর বাজারে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলটির প্রধান আকর্ষণই এখানে।' ১৯৭৮ সালে মাহাথির মোহাম্মদ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনা ও বিনোয়োগকারীদের সর্বাধিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। '৮১ সালে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর সরকারি সংস্থাগুলোর দ্রুত বেসরকারিকরণ করেন। এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি বিনোয়োগকে উৎসাহিত করেন। প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক পুঁজির অবাধ শোষণ-লুণ্ঠন নিশ্চিত করার জন্যই এই নীতি গ্রহণ করা হয়। দেদারছে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ায় এসময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫ হাজারের মতো কোম্পানি তাদের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ও বিতরণকেন্দ্র মালয়েশিয়ায় স্থাপন করে। ফলে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিখাত ও বৈদেশিক বিনোয়োগের মধ্য দিয়ে মালয়েশিয়ায় একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুরম্য অট্টালিকা, আলো ঝলমলে নগরীর যে চিত্র আমরা দেখি তা এই পুঁজির প্রয়োজনেই সৃষ্টি।

কিন্তু এই আলোর নিচেই আছে অন্ধকার। আমেরিকান জরিপ সংস্থা ভেরিটে'র তথ্যমতে, মালয়েশিয়ায় ইলেকট্রনিকস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দাসের মতো খাটানো হয়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের ২০১৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর মাঝে সবচে খারাপ শ্রমপরিবেশের দেশগুলোর যে তালিকা প্রস্তুত করেছে, তার মাঝে মালয়েশিয়া অন্যতম। মালয়েশিয়াই সবচেয়ে বেশি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করছে। শুধু তাই নয়, নানান প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়া সরকার বৈধ শ্রমিকদের চেয়ে অবৈধ শ্রমিকদের নিয়োগে পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করছে। শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রমের ফল উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করেই তথাকথিত প্রবৃদ্ধি অর্জন। সেদেশের মাথাপিছু আয় ৬ হাজার ৭০০ ডলারে উন্নীত হয়। সুরম্য অট্টালিকা, আলোর রোশনাই, প্রবৃদ্ধি আর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কথা প্রচারিত হলেও এর পেছনে লুকিয়ে থাকা শ্রমিকদের রক্ত ঘাম আর চোখের জলের ইতিহাস বিশ্বের কাছে থাকে গোপন। এই শোষিত শ্রমিকরা যেন অন্যায় অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে না পারে, সংঘবদ্ধ হতে না পারে, পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্যেই মিছিল, সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা, গণতন্ত্রকে সীমিত করা হয়। ফলে এই যে আপাত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এর পেছনে আছে একচেটিয়া পুঁজির নির্মম শোষণের ইতিহাস।

এ-হেন প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি তথা উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে শুনিয়েই বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার এদেশে ফ্যাসিবাদী শাসনের ভিত পাকা করছে। যে উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র ছাড় দিতে বলা হচ্ছে কোথায় সেই উন্নয়ন? কিছু অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে। এগুলো দেখেই অনেকে ভাবছেন দেশ বুঝি উন্নয়নের জোয়ারে সত্যিই ভেসে গেল! কিন্তু আমরা কি জানি, যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার কারণে প্রতিবছর জনগণের কাঁধেই শেষপর্যন্ত বাড়ছে করের বোঝা। রাষ্ট্রীয় খাতে সীমাহীন দুর্নীতির কথা নাই বা বলা হলো। বাজেটের আয়তন বাড়ছে কিন্তু জনগণের জীবনে তার সুফল কই? বেকারীর ভয়াবহতা এতদিন অন্ধকারে ছিল, আজ আমরা সবাই জানি কি বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কতজন সাগরে ডুবে মরেছে, কতজনের গণকবর হয়েছে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে। খাবার জোগাড় করতে না পারায় মা তার সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ ভিক্ষার জন্য হাত পাতছে, কত নারী অভাবের তাড়নায় দেহবিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে – এই তো আমাদের দেশ আর এই তো শাসকশ্রেণীর উন্নয়নের নমুনা।

এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ আজকের দিনে পুঁজির চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "পুঁজিবাদী অর্থনীতি, যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মূল বনিয়াদ, তা পরিচালিত হয় সর্বোচ্চ মুনাফালাভের মৌলিক নিয়মের ভিত্তিতে। পুঁজিবাদী সমাজের উপরকাঠামোটির উদ্দেশ্য তাই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের এই নিয়মকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে রূপায়িত করা। কিন্তু এই নীতিকে কার্যকরী করবার মতো পরিস্থিতি সবসময় একইরকম থাকে না, ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুঁজিপতিশ্রেণীকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নিয়মটি যাতে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে রূপায়িত হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য উপরকাঠামো, তার অর্থনৈতিক সংগঠনের রূপ ও রীতিনীতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনযন্ত্র ইত্যাদিতে পরিবর্তন করতে হয়। ... বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের জন্য সেই সময় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ছিল শান্তি ও অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থা বজায় রাখা। সেই সময় পার্লামেন্ট ছিল আদর্শ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা বুর্জোয়াদের এইসব প্রয়োজন মেটাতে পারত। একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে অবাধ প্রতিযোগিতার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং শান্তির জায়গায় সামরিকতন্ত্র। পার্লামেন্ট, যা অতীতের বুর্জোয়া অর্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার ফোরাম, তা বর্তমান সময়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে, ধীরে ধীরে তার সময়োপযোগিতা হারাচ্ছে। ফলে বুর্জোয়াদের কাছে পার্লামেন্ট দ্রুত তার উপযোগিতা হারাচ্ছে এবং ফ্যাসিবাদ নানারূপে পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনিক যন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করছে।" মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশ – সর্বত্র এই জিনিসটিই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে হয়, উন্নয়ন কখনোই শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। অর্থনীতির সাথে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উন্নতি মিলেই উন্নয়ন। ফলে রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে, প্রতিদিন মানুষের রুচি-সংস্কৃতির মান নিচে নামিয়ে – একটা সমাজের উন্নয়ন বা অগ্রগতি ঘটে না, বরং তা এযাবৎ মানবসভ্যতার অর্জিত মূল্যবোধগুলোকেই পদদলিত করে। এই মূল্যবোধকে পদদলিত না করে আজকের দিনে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায় না, লুটপাট করা যায় না। এই লুটপাট ও পুঁজিবাদী শোষণের মধ্য দিয়ে বিগত ৪৪ বছরে এদেশেও একটি একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। একচেটিয়া এই পুঁজির শোষণের পথকে নিষ্কণ্টক করতেই শাসকশ্রেণী 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়নে'র শ্লোগান তুলছে। তাই বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পথ না হারিয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একে বিচার করে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

মানব পাচার : পুঁজিবাদের নগ্ন চেহারা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হয়ে আছে বিভিন্ন দেশের কারাগারে। এদের কাউকে কাউকে জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে। নারীরা হয়েছে নির্যাতনের শিকার, অনেক নারীকে লাগানো হয়েছে দেহব্যবসায়। এ যেন ইতিহাসের ফেলে আসা সেই দাস ব্যবসার কাহিনী। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, প্রগতি, উন্নয়ন ইত্যাদি সমস্ত ছেঁদো কথাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মানবসভ্যতা যেন ইতিহাসের সেই কালোযুগেই আটকে আছে।

এসব খবরে সারাদেশের মানুষ শিউরে উঠেছে। পাচারের শিকার হতভাগ্যদের পরিবারেও চলছে আহাজারি। মানবপাচার বাংলাদেশে এমন ভয়াবহ রকমের শোচনীয় রূপ নিয়ে – দেশের মানুষ এ কথা ভাবতেই পারেনি। ভুক্তভোগীরা, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসব কথা জানতেন, কিন্তু বিষয়টি কখনোই আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়নি। থাইল্যান্ডে অভিযান শুরু না হলে এ বিষয়টি দেশের বিবেকবান সচেতন মহল জানতেই পারত না। মানব পাচারের এই ভয়াবহ চিত্র দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন এমন ঘটছে? আমাদের রাষ্ট্র, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো কী করছে? যে-সব দেশে এই পাচারের ঘটনা ঘটছে তাদের ভূমিকাই বা কী?

মানব পাচারের ভয়াবহ চিত্র

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ২৫ হাজারের মতো বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা পাচারের শিকার হয়েছে। এ সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ। ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগর দিয়ে অবৈধভাবে গেছেন ৫৩ হাজার লোক। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩ হাজার। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ এসব যাত্রায় ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে মারা গেছেন প্রায় হাজার খানেক মানুষ। তাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর নির্যাতনে। অনেকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলা থেকে মানব পাচারের ঘটনা ঘটলেও প্রধানত ৪১টি জেলা থেকে পাচারের মাত্রা বেশি। সীমান্তবর্তী সব জেলায়ই পাচারকারী চক্র সক্রিয়। শুধু সমুদ্রপথে নয়, স্থলপথে, বিমানপথেও পাচার হচ্ছে মানুষ। এমনকি হজ্বে পাঠানোর নাম করেও সৌদি আরবে মানব পাচারের ঘটনা ঘটছে। কয়েক বছর আগেও ঢাকা বিমানবন্দর ছিল শিশু ও নারী পাচারের নিরাপদ রুট। আর স্থলপথে মানব পাচারের ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গের কারাগারেই দেড় হাজারের বেশি বাংলাদেশি আটক আছেন। ভারত ও পাকিস্তানের কারাগারে আটক বাংলাদেশি এবং এ দু'দেশের পতিতালয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের সংখ্যাও বিরাট। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের দাবি, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ পাচার হয়ে যায়। ইউএনডিপি বলেছে, গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৩ লাখ ও তিন দশকে ১০ লাখ।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, মানব পাচারের ক্ষেত্রে দেশে এবং দেশের বাইরে এক বিরাট সিন্ডিকেটে প্রায় ৪ শতাধিক পাচারকারী সক্রিয় রয়েছে। সমুদ্রপথে পাচারের ক্ষেত্রে তিন স্তরের চক্র কাজ করে – প্রথম স্তরের চক্রটি বিদেশে অবৈধভাবে যেতে আগ্রহীদের সংগ্রহ করে; বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে পাচারের কাজটি করে দ্বিতীয় চক্র এবং তৃতীয় চক্রটি দেশের বাইরে তাদের গ্রহণ করে। স্বাভাবিক নিয়মে মালয়শিয়া যেতে খরচ হয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা অথচ বিকল্প রুটে খরচ বলা হয় মাত্র ১০ হাজার টাকা। মাত্র ১০ হাজার টাকা খরচের মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ আদায় করা হয়। টাকা দিতে ব্যর্থদের এমনকি মেরেও ফেলা হয়।

পাচারের শিকার হওয়া মানুষগুলো কারা?

যেদিন সরকার চলতি অর্থবছরে মানুষের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৪ ডলারে উন্নীত হওয়ার ঘোষণা দিল, সেদিনই মালয়েশিয়ার উপকূলে ভাসমান রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কয়েক শ বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুর আহাজারির সচিত্র খবর দেশবাসী দেখেছেন। রোহিঙ্গারা তাদের দেশে অবাঞ্ছিত, বিতাড়িত। তাদের দেশে সামরিক শাসন চলছে। সে কারণে তারা দেশে দেশে আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকেরা এভাবে কেন পাচারের শিকার হচ্ছে? স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও কেন এ দেশ তাদের ন্যূনতম মানবিক ও নাগরিক সুবিধাটুকু দিতে পারল না? দেশে তো গত দুই যুগ ধরে কেবল উন্নয়নের জোয়ারই বয়ে চলছে! বিশেষত বর্তমান আওয়ামী মহাজোট তো 'উন্নয়নে'র জন্য 'গণতন্ত্র'কে খানিকটা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলছেন। সেই 'উন্নয়নে'র ধাক্কাতেই কিনা গত দুই বছরে পাচারের সংখ্যা এভাবে বেড়ে গেল?

আসলে শাসকরা যত কথাই বলুক না কেন, দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবনে 'উন্নয়ন' কথাটা কোনো অর্থ বহন করে না। দেশে যে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা চলছে তার ফলে একদিকে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবন থেকে প্রতিবছরই লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছেন। এই মানুষগুলোর বড় অংশই মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পায়নি। তাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগও সরকার তৈরি করছে না। ফলে দেশের ভেতরে তাদের সামনে কোনো ভবিষ্যত নেই, সম্ভবানা নেই। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও রাষ্ট্র এবং শাসকরা করতে পারছে না। এ অবস্থায় তারা গিয়ে পড়ছে পাচারকারী চক্রের হাতে। এরা জীবন হারাচ্ছে, অর্থ হারাচ্ছে।

আসলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজটি স্বাধীনতার পর থেকে কখনোই করা হয়নি। ফলে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ শ্রমশক্তির পাশাপাশি স্বল্প শিক্ষিত অদক্ষ শ্রমশক্তি – সকলেই কর্মসংস্থানের খোঁজে দেশের বাইরে গিয়েছে। এদের মধ্যে সংখ্যায় গরিব মানুষের সন্তানেরাই বেশি। আর সম্প্রতি একদিকে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান কমছে, অন্যদিকে প্রধান শ্রমনির্ভর বাজারগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশীদের যাবার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুঁজির পুঞ্জিভবন তীব্র হয়েছে, বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গিলে খাচ্ছে এবং বাংলাদেশের বাজারে বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ বেড়েছে। এর ফলে ক্ষুদে মালিকানা থেকে, কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। শিল্পায়ন বলতে বিশেষ কিছুই হচ্ছে না এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিবর্তে প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পের প্রবণতা বেড়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের হার কমেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী গত দশ বছরে দেশে বেকারত্ব বেড়েছে ১.৬ শতাংশ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার কমেছে ২ শতাংশ। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বলছে বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির বর্তমান হার ৩.৭ শতাংশ, যেখানে প্রতিবছর ২৭ লাখ মানুষ কর্মবাজারে প্রবেশ করলেও চাকরি পাচ্ছেন মাত্র ১ লাখ ৮৯ হাজার। এই ধারা বজায় থাকলে চলতি বছরেই দেশে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ছয় কোটিতে। এদিকে বিনিয়োগ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, গত চার অর্থবছরের ব্যবধানে ব্যক্তিখাতে কর্মসংস্থান কমেছে ৩ লাখ ৭৬ হাজার। বিনিয়োগ বোর্ডের হিসাবমতে, ২০১০-'১১ অর্থবছরে ব্যক্তিখাতে ৫ লাখ ৩ হাজার নতুন কর্মসংস্থান হয়, যা ২০১১-'১২ অর্থবছরে নেমে আসে ৪ লাখ ৫১ হাজারে। ২০১২-'১৩ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৯ হাজারে। এভাবে প্রতিবছরই ব্যক্তিখাতে কর্মসংস্থান কমছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপের ফলে বলা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৪ বছরে ৩৪ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় বাড়ছে দক্ষ-আধাদক্ষ বেকারের সংখ্যা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে বর্তমানে ৬৮ লাখ লোক কর্মরত। অথচ ২০০৫-'০৬ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২ লাখ। এটা সবারই জানা যে আদমজীসহ দেশের পাট, চিনি, কাগজ, বস্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হল কৃষি। কিন্তু সেই কৃষিতেও ভয়াবহ নৈরাজ্য বিরাজ করছে। ধান থেকে শুরু করে গম, সবজি কোনো ফসলেরই ন্যায্য মূল্য চাষীরা পায় না। বীজ-সার-ডিজেল-কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া এবং ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে চাষীদের লোকসানের পরিমাণ তিনগুণ, চারগুণ পর্যন্ত হয়। এই লোকসানের ধাক্কায় প্রতিবছরই হাজার হাজার প্রান্তিক দরিদ্র চাষী সর্বস্বান্ত হচ্ছে, জমি হারাচ্ছে। মধ্য চাষী পরিণত হচ্ছে দরিদ্র চাষীতে।

এসব কিছুর সাথে রাষ্ট্র-প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ এবং দুর্বৃত্তায়ন এত ব্যাপক রূপ নিয়েছে যে আইনের শাসন বলে কিছুই টিকে নেই। একটা সামান্য পিয়ন-কেরানির চাকুরির জন্য ৩ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। বৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার পথে পথে বহু বাধা। উপায়হীন এ পরিস্থিতিতে গরিব মানুষ জীবিকার আশায় অবৈধ পথে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে।

কথিত 'উন্নত' দেশের বর্বর চেহারা

একদিন দাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত, তাদের নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হত ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে। এদের অনেকেই জাহাজে মারা যেত, তাদের লাশ পায়ে পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দেয়া হত সমুদ্রে। নারীদের দিয়ে দেহব্যবসা করানো হত। বলা হচ্ছে সভ্যতা আগের চেয়ে অনেক এগিয়েছে, এখন গণতন্ত্রের জয়-জয়কার চলছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী মুনাফানির্ভর ব্যবস্থায় দাস ব্যবস্থা নতুন চেহারা নিয়েছে।

সমগ্র ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতেই অভিবাসী শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরিতে খাটানো হয়। তাদের কোনো ধরনের আইনি অধিকার বা সুরক্ষা দেওয়া হয় না। কৃষি শ্রমিকদের বড় অংশ, গৃহস্থালী শ্রমিকদের বিশাল অংশ এবং কোনো কোনো শিল্পেও অবৈধ শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও একই চিত্র। কেননা এর সুবিধা হলো, এই শ্রমিকরা কোনো আইনগত অধিকার পায় না, কম মজুরিতে এদের নিয়োগ করা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবৈধ শ্রমিকদের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে চাপ কম হয়। যে কোনো সময়ে এদেরকে বহিস্কার ও শাস্তি দেয়া যায়, এদের ওপর আইনি নিপীড়ন চলে ব্যাপক। যে কোনো মুহূর্তে এদেরকে বেআইনি হিসেবে চিহ্নিত করে তার দায়দায়িত্বও অভিবাসীদের ওপরই চাপিয়ে দেয়া যায়। এতসব সুবিধার কারণেই এসব দেশ বৈধ পথে শ্রমিক আনার চেয়ে অবৈধ পথে তাদের আনায় উৎসাহ দেয়। সম্প্রতি এক তথ্যে দেখা গেছে, ইতালি পুলিশের ধারণা, ভূমধ্যসাগরে মানবপাচারের মাধ্যমে ৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার কামিয়েছেন পাচারকারীরা। সিরিয়ায় চলমান যুদ্ধের কারণে বিপুল সংখ্যক সিরিয় নাগরিক আশ্রয়ের জন্য ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছে। গত বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার শরণার্থী। আর সে সময় উদ্ধার করা হয়েছে আরো দুই লাখ শরণার্থীকে।

গণতন্ত্র আর মানবতার চ্যাম্পিয়ান খোদ আমেরিকার মাটিতেই অভিবাসীরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলছেন, কালোরা সেখানে এখনো কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের বেশি মর্যাদা পান না। একই অবস্থা সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, লিবিয়া ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের এবং এশিয়ার থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি উন্নত বলে খ্যাত দেশগুলিতেও। এই দেশগুলিকে আমাদের সামনে উন্নয়নের মডেল হিসাবে হাজির করা হয়। এখনও বাংলাদেশের দেয়ালে বিলবোর্ডে লেখা দেখা যায় – 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাহাথির'। অথচ আমেরিকান জরিপ সংস্থা ভেরিটে'র তথ্যমতে, মালয়েশিয়ায় ইলেকট্রনিকস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দাসের মতো খাটানো হয়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের ২০১৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর মাঝে সবচে খারাপ শ্রমপরিবেশের দেশগুলোর যে তালিকা প্রস্তুত করেছে, তার মাঝে মালয়েশিয়া অন্যতম। এই তালিকাতে এরচেয়ে নিকৃষ্টতর স্থান পেয়েছে কেবলমাত্র সামরিক শাসন বা যুদ্ধপরিস্থিতিতে থাকা দেশগুলো। মালয়েশিয়াসহ এই তালিকাভুক্ত দেশগুলোতে শ্রমপরিবেশের কোনো নিশ্চয়তা নেই কিংবা নামমাত্র আইনগত কিছু প্রতিশ্রুতি থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই। নব্য শিল্পায়িত এই দেশগুলোর মাঝে মালয়েশিয়াই সবচেয়ে বেশি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করছে। শুধু তাই নয়, নানান প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়া সরকার বৈধ শ্রমিকদের চেয়ে অবৈধ শ্রমিকদের নিয়োগে পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করছে। ধারণা করা যায়, আজ মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অভিবাসী শ্রমিকের প্রয়োজন কমে গেছে বলেই মানব পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে।

আসলে পুঁজির চরিত্র তো সারা দুনিয়া জুড়েই এক – সে ইউরোপ হোক আর এশিয়া, মালয়েশিয়া হোক আর বাংলাদেশ। তার ধর্মই হল সস্তা শ্রম লুণ্ঠন, বাজার লুণ্ঠন এবং মুনাফা। প্রথমে সে নিজের দেশের শ্রমিকদের শোষণ করে, দেশের অভ্যন্তরের বাজার লুট করে। সেই বাজার যখন সংকুচিত হতে থাকে তখন সস্তা শ্রমের আশায় পুঁজি নিজের দেশ ছাড়িয়ে অনুন্নত দেশগুলিতে গিয়ে হানা দেয়। যেমন দিচ্ছে বাংলাদেশে।

গরিব মানুষের পাশে শাসকরা থাকে না

সম্প্রতি মানব পাচারের এই ভয়াবহ চিত্র উন্মোচিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, 'আমরা শুধু বৈধ শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করি। অবৈধ শ্রমিকদের নিয়ে নয়।' পাচার রোধ বা পাচার হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর ব্যাপারে নাকি তার বা তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেই, এটি দেখবে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হল, মানব পাচার নিয়ে স্বরাষ্ট্র কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীরও কোনো বিবৃতি বা ব্যাখ্যা দেশবাসীর চোখে পড়েনি। আসলে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী বা সরকার কি বৈধ শ্রমিকদের দায়ই নিয়েছে? তাই যদি নিত তাহলে প্রতি বছর শত শত শ্রমিকের লাশ দেশে আসার পর কি ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন? দেশের ভেতরে শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের বিচার তারা কতটুকু করেছেন? পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি-কোস্টগার্ড-নৌবাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে কেমন করে হাজার হাজার বাংলাদেশি পাচারা হয়ে গেল?

মানব পাচার নিয়ে যখন ব্যাপক হইচই চলছে তখন বেশ কয়েকজন মানব পাচারকারী গ্রেফতার এবং কয়েকজন ক্রসফায়ারে নিহতের খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে কতগুলো সাধারণ স্তরের ছিঁচকে পাচারকারী দিনের পর দিন প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে এই বিরাট অন্যায় চালিয়ে গেছে। এর পেছনে সরকার-প্রশাসনের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিরা জড়িত বলেই জনমনে ধারণা। সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, একটা বিরাট সিন্ডিকেট এ মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত যারা শীর্ষে ক্ষমতাবানরা অবস্থান করে। এ ধারণা আরো জোরালো হয় যখন ক্রসফায়ারে পাচারকারী-চক্রের নিচের দিকের লোকদের হত্যা করা হয়। মানুষের মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয় যে রাঘব বোয়ালদের আড়াল করার উদ্দেশ্যেই চুঁনোপুটিদের খুন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ। গত অর্থ বছরে (২০১৪-'১৫) এর পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা। অন্যদিকে গত দশ বছরে দেশে এসেছে প্রায় বিশ হাজার প্রবাসী শ্রমিকের লাশ। এই লাশের দায় কেউ নেয়নি। একইভাবে দেশের অভ্যন্তরে যারা শ্রম দিয়ে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আনার কাজটি করে সেই গার্মেন্ট শ্রমিকদের চিত্রও একই রকম ভয়াবহ। তাদের মজুরি নামমাত্র। তারা ভবন ধসে, আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় না, এমনকি তারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও পায় না। এই অবস্থা দেশের সমস্ত গরিব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ অবস্থায় একদিকে মানব পাচারের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচার এবং পাচারকারী সিন্ডিকেটের হোতাদের আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলতে হবে। পাচারকারী চক্রের হাতে নিহতদের পরিবারগুলোকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ ও দ্রুত পুনর্বাসন, বিদেশে আটক এবং সমুদ্রে ভাসমান নারী-পুরুষ-শিশুদের ফিরিয়ে এনে দেশে কর্মসংস্থান করাসহ দেশের অভ্যন্তরে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের দাবিতে জোরদার গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গরিব শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

কম গণতন্ত্র বেশি উন্নয়ন নাকি বেশি শোষণ কম অধিকার?

মালয়েশিয়ান মডেল

গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে নির্বাচন করেছিল। কিন্তু অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে কোন্ ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা? শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত জনসভায় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সে খবরটি ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বেশি গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না।' অবশ্য 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' বা উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বেশ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। কথায় কথায় যারা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি দাবি করেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বুলি আওড়ান তাদের কাছে প্রশ্ন, এদেশের মানুষ জান বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতা ও শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য – নাকি এই 'কম গণতন্ত্রের' জন্য?

পরাধীন আমলে সামরিক স্বৈরাচার আইয়ুব সরকার 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেছিল। এই তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে জনগণের সর্বজনীন ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক কায়দায় যে শোষণ-লুণ্ঠন নিপীড়নের শাসন কায়েম করেছিল – এদেশের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যেন তাদের বিরুদ্ধে রায় দিতে না পারে সে জন্যই গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল বাংলার মানুষ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অকাতরে জীবন দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের এই আকাঙ্ক্ষার সাথে, চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শাসকগোষ্ঠী দেশ পরিচালনা করে আসছে।

নব্বই পরবর্তী সময়ে ভোটের যে অধিকারটুকু ছিল, গত নির্বাচনে তাও কেড়ে নেয়া হয়েছে। মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নেই, গুম-খুন-ক্রসফায়ার লাগাতার বাড়ছে, মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে – অর্থাৎ রাষ্ট্র সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে ক্রমাগত আরও ফ্যাসিস্ট চেহারায় আত্মপ্রকাশ করছে। উন্নয়নের জিকির তুলে এভাবেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে করা হচ্ছে সংকুচিত। উন্নয়ন ও গণতন্ত্র একটিকে অপরটির বিপরীতে দাঁড় করিয়ে পুঁজিবাদী শোষণের চাপে পিষ্ট অসহায় জনগণকে মিথ্যে স্বপ্নের প্রলোভন দেখিয়ে জনসমর্থনের পাল্লা ভারী করতে চাইছে। একশ্রেণীর পোষা বুদ্ধিজীবীও 'আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র', 'উন্নতি চাইলে গণতন্ত্রকে সীমিত করতে হবে' – এই ধারণার পক্ষে তাত্ত্বিক ভিত্তি জোগাচ্ছেন, জোরালো মত *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধান-সহ ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, খোদ কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় ও মানব পাচারকারী সিন্ডিকেটের শাস্তির দাবিতে ১৬ মে ঢাকায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার বিক্ষোভ

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গে বাম মোর্চা

সরকার নির্বাচন নামক প্রহসন মঞ্চস্থ করেছে

গত ১১ মে ১২টায় তোপখানা রোডস্থ কমরেড নির্মল সেন মিলনায়তন-এ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোর্চার সমন্বয়ক মোশরেফা মিশু। উপস্থিত ছিলেন মোর্চার নেতৃবৃন্দ শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সাইফুল হক, এড. আবদুস সালাম, মোশাররফ হোসেন নান্নু, সিদ্দিকুর রহমান, হামিদুল হক, মহিনউদ্দিন লিটন প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, "আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন ও সন্ত্রাসী দলীয় ক্যাডারদের সহায়তায় সরকার আবারো নির্বাচন নামক এক প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ করেছে। সরকার, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা ভোট শুরুর পূর্বেই অনেক কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ভরে রাখা, সরকার সমর্থিত প্রার্থী ব্যাতিত অন্য প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেওয়া, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং সরকার দলীয় ক্যাডার কর্তৃক ইচ্ছামত সীল মেরে ব্যালট পেপার বক্সে ভরানো, সকাল ১০টা পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রের চারশত গজের মধ্যে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে না দেওয়াসহ ভোট জালিয়াতির সকল পন্থাই অবলম্বন করা হয়। প্রার্থীরা ভোট চলাকালীন সময়ে ভোট ডাকাতি ও প্রহসনের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। অথচ সরকার এবং নির্বাচন কমিশন নির্লজ্জভাবে দাবী করছেন সিটি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে।

সিটি নির্বাচন ঘোষণার পর গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিল – বর্তমান সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিদ্যমান নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী কাঠামোর অধীনে দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। অগণতান্ত্রিক শাসনকে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার লক্ষ্যে এবং বিরোধীদের কোনঠাসা করে রেখে নিজেদের প্রার্থীদের জিতিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মহাজোট সরকার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে তড়িঘড়ি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা দেয়। আমরা বলেছিলাম সরকারের আজ্ঞাবহ বর্তমান নির্বাচন কমিশন এবং বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় জাতীয় নির্বাচন দূরে থাক, স্থানীয় সরকার নির্বাচনও আপাত নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কার্যত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঘটেছেও তাই।"

বাম মোর্চা তিনটি সিটি করপোরেশনে ভোট ডাকাতি ও প্রহসনের নির্বাচন বাতিল এবং জনপ্রতিনিধিত্বহীন বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে।

জাতীয় কমিটির সমাবেশ

সুন্দরবন ধ্বংসকারী বিদ্যুৎপ্রকল্প বাতিলের দাবি

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী'র বাংলাদেশ সফরের সময় সুন্দরবনধ্বংসী বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ও সুন্দরবন রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২১ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসকাবের সামনে সুন্দরবনধ্বংসী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সকল অপতৎপরতা বন্ধ, জ্বালানী সম্পদের শতভাগ দেশের কাজে নিয়োগ, বাপেক্স-পেট্রোবাংলাকে পঙ্গু করে বিদেশিদের হাতে তেল-গ্যাস সম্পদ তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ এবং খনিজ সম্পদ রফতানি নিষিদ্ধ করা সহ জাতীয় কমিটির ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ, বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ আবুল মাকসুদ, প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, রুহিন হোসেন প্রিন্স ও সাইফুল হক। শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মোশারফ হোসেন নান্নু, বজলুর রশীদ ফিরোজ, জোনায়েদ সাকী, সিদ্দিকুর রহমান, মোশরেফা মিশু, সাজ্জাদ জহির চন্দন, রাজেকুজ্জামান রতন, আজিজুর রহমান, বহ্নি শিখা জামালী, মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন, মীর মোফাজ্জেল মোস্তাক, সামছুল আলম, সুবল সরকার প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, জনগণের সম্পদ রক্ষায় জনগণকেই জেগে উঠতে হবে। তিনি সুন্দরবন ধ্বংসের সরকারি অপতৎপরতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, দেশের জনগণই সুন্দরবন ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করবে। এজন্য আমরা অতীতের মতো আগামী দিনেও জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলব। সমাবেশে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত সংবিধানে দেশের সব সম্পদের মালিকানা জনগণকে দেওয়া হয়েছে। অথচ সরকার এবং পার্লামেন্টের এমপিরা সংবিধানের এই নির্দেশ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের হাত দিয়েই সুন্দরবন ধ্বংস, গ্যাস লুটপাট ও জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই জন্য বর্তমান ও অতীতের সরকারগুলোকে জনগণের সামনে জবাবদিহী করতে হবে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ বলেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে সরকার সুন্দরবন ধ্বংসের বিদ্যুৎ প্রকল্প এগিয়ে নিচ্ছে। এছাড়াও সুন্দরবন ধ্বংসে আরও বিদ্যুৎ প্রকল্প, শীপইয়ার্ড, সাইলো, সিমেন্ট কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতীয় আইনেও সুন্দরবনের এত কাছে কোনো বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমতি পাওয়া অসম্ভব ছিল। তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন বাংলাদেশ সফরের সময় সুন্দরবন ধ্বংসী বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার জন্য দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। সম্প্রতি স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার বিরোধীতা করে তিনি বলেন, দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-পেট্রোবাংলাকে পঙ্গু করে দেশের সম্পদ বিদেশিদের দেওয়ার যেকোনো চক্রান্ত দেশবাসী রুখে দাঁড়াবে।

সমাবেশের বক্তারা দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠী কর্তৃক আমাদের জাতীয় সম্পদ লুটপাটের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, ঘরে ডাকাত পড়লে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করলে সর্বস্বান্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকবে না। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল তোপখানা রোড ঘুরে পুরানা পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

অভিজিৎ রায় ও অনন্ত বিজয় দাশ-এর খুনীদের গ্রেপ্তার দাবি

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১২ মে এক বিবৃতিতে সিলেটে 'যুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক, বিজ্ঞান লেখক ব্লগার অনন্ত বিজয় দাশের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানান এবং অবিলম্বে ঘাতকচক্রের গ্রেফতার এবং বিচার দাবি করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'মুক্তচিন্তাবিরোধী উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি টার্গেট করে বারবার এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলেও এখনো পর্যন্ত তাদের গ্রেফতারে প্রশাসনের ব্যর্থতা জনগণের নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বহীনতার সামিল। ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক শাসন বহাল রেখে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি বহাল রেখে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে না – এ ঘটনা আরেকবার সেটাই প্রমাণ করল। বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র নিজেই যখন ক্রমাগত সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি এমনকি ন্যূনতম আইনের শাসনকে লঙ্ঘন করতে থাকে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি চর্চা করতে থাকে, তখন সমস্ত ধরনের অপশক্তি পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং গোটা সমাজ নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়।' তিনি বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে জানমালের নিরাপত্তাসহ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

সিলেট : অনন্ত বিজয় দাস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে ১২ মে দুপুর ১টায় শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার পক্ষ থেকে ১৭ মে বিকেলে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা ও বিজ্ঞান লেখক অনন্ত বিজয় দাশের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং অভিজিৎ রায়ের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৩ মে বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাশেদ শাহরিয়ার, বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংগঠক আবু নাঈম।

বক্তারা বলেন, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শত শত মানুষের উপস্থিতিতে পুলিশের নাকের ডগায় বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এদের হোতাদের আজও বিচারের আওতায় আনতে পারেনি সরকার। বিচারহীনতার এই পরিস্থিতি চলতে চলতেই খুন হলেন বিজ্ঞান লেখক অনন্ত বিজয় দাশ। যে কোনো মুক্তচিন্তার মানুষের জন্য এই অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর। বক্তারা আরও বলেন, এই পরিস্থিতি দেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশে আজ আইনের শাসনের ন্যূনতম চর্চা নেই। বিচারহীনতার সংস্কৃতি দৃঢ় হয়েছে। গোটা সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ভয়ের পরিবেশ। এমন দমবদ্ধ অবস্থায় সকল প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিকমনা মানুষদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

এছাড়া বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা শাখা ১৪ মে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে এবং বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ২২ মে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২২ মে বিকালে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ই-মেইল: sammobad@spbm.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org